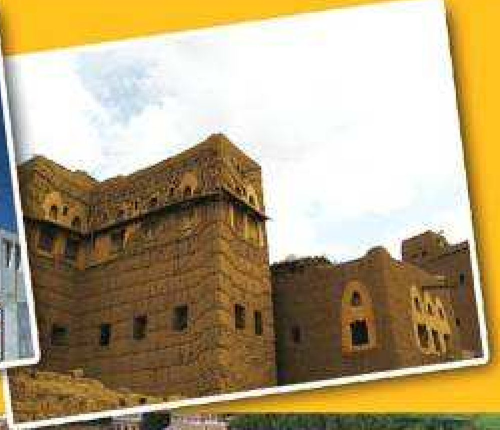
তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৩






দারুল হাদীছ দাম্মাজ

সাক্ষাৎকার :

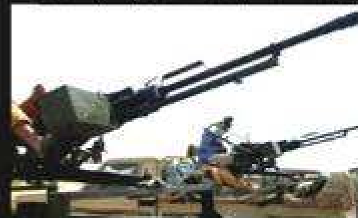
মুহতারাম আমীরে জামা'আত

- তাওহীদে রুবূবিয়াত
- শিশুদের নিরপত্তাবিধানে ইসলাম
- যুবসমাজের কতিপয় সমস্যা
- অমুসলিমদের যবানীতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)
- স্মৃতির পাতায় মাওলানা বদীউযযামান



মালিতে সালাফীদের বিরুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর দমন অভিযান








The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

১১তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নষ্ট সংস্কৃতির হিংস্র ছোবলে তরুণ প্রজন্ম

তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদেরকে যদি উৎকৃষ্ট আদর্শ ও উত্তম চরিত্রে গড়ে তোলা যায়, তবে তারা দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে। আর তারা যদি ভ্রান্ত দর্শন ও নষ্ট সংস্কৃতির ছত্র-ছায়ায় বেড়ে উঠে, তবে তারাই হবে দেশ ও জাতি ধ্বংসের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। উক্ত চূড়ান্ত বাস্তবতা জানার পরও একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী তরুণ প্রজন্মকে নিরন্তর অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রগতির দোহাই দিয়ে পাশ্চাত্যের অপসভ্যতার ক্রীড়নক হিসাবে গড়ে তুলছে। নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা দর্শন দ্বারা তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করছে। ঢাকার শাহবাগসহ বিভিন্ন স্থানে সেই জিঘাংসার বিষবাষ্প প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে। একমাত্র চিরন্তন জীবন বিধান ইসলাম এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কেও তারা মিথ্যা বেসাতি প্রচার করছে। যারা বস্তাপচা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। তাদের জানা আবশ্যক যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান ও তাঁর নবী-রাসূলদের বিরোধিতা করে কেউ টিকে থাকতে পারেনি। নূহ (আঃ)-এর কওম, 'আদ, ছামূদ, লূত্ব (আঃ)-এর জাতি ও ফেরাউনরা তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

মূলতঃ ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকরা ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সচ্চরিত্র আর কুচরিত্র নির্ণয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলসহ সবকিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত আছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে' *(সূরা আহযাব ২১)*। তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৪)*। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। তিনিই ভাল জানেন কোন চরিত্রে গড়ে উঠলে মানুষ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে পারবে। তাই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শই যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলামপূর্ব সমাজ জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ব্যভিচার, খুন, মদ্যপান, অন্যায়-অত্যাচার ও নষ্টামিতে ভরপুর ছিল। আর এ জন্যই সে যুগকে বর্বরতা ও মূর্খতার যুগ বলা হয়। উক্ত পতিত সমাজেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেই নোংরা জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন শুরু করেছিলেন যুবকদের মাধ্যমে। রাসূল (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথম ১০ম বছর মানুষ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অবশেষে ১১ নববী বর্ষে হজ্জের সময় মদীনা থেকে আসা ৬ জন যুবকের সামনে রাসূল (ছাঃ) তাঁর দাওয়াত পেশ করেন। সেই দাওয়াত তারা মদীনায় প্রচার করেন। ফলে পরের বছর পুরানো পাঁচ জন এবং নতুন সাত জন মোট বারো জন মক্কায় এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করেন। তাদের কাছে রাসূল (ছাঃ) যে কর্মসূচী পেশ করেছিলেন তার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তরুণ সমাজ ব্যক্তিগতভাবে যাবতীয় অন্যায় ও নোংরা কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেই সাথে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করবে। নির্দিষ্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের সংগ্রাম করবে। রাসূল (ছাঃ) উক্ত কর্মসূচীর আলোকে তরুণদের মাধ্যমে অন্ধ জাহেলিয়াতের শিকড় উপড়ে ফেলেছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) যেমন শিরকের উৎস মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন *(আম্বিয়া ৫৮)*, তেমনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিনে কা'বা চত্বর থেকে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ)*। অতঃপর যুবক আলীকে ছবি-মূর্তি ও পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/২২৮৭; মিশকাত হা/১৬৯৬)*। সেই সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদকে দ্বারা উয্যা নামক নগ্ন জিনরূপী মূর্তিকে হত্যা ও তার আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন *(নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৯০২, সনদ ছহীহ)*। ব্যভিচার, হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, মদ্যপান, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে শক্ত আইন করেন এবং বলিষ্ঠভাবে তা প্রয়োগ করেন। উক্ত আপোসহীন ভূমিকার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যাবতীয় জাহেলিয়াত দূর করেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোনালী সমাজ। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর যুগই সোনালী যুগ বলে প্রথম স্বীকৃতি পায়। কারণ উক্ত আদর্শের আলোকেই আবুবকর, ওমর, উছমান, আলী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। বেলাল (রাঃ)-এর মত দাসও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অন্যায় কাজ করে এসে অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। যেনার মত অপরাধ করে রজমের মত কঠিন শাস্তি ভোগ করার জন্য বারবার রাসূলের দরবারে ছুটে এসেছে *(মুসলিম হা/৪৫২৭; মিশকাত হা/৩৫৬২)*। অথচ কোন গোয়েন্দা ছিল না, পুলিশ ছিল না, র‌্যাব ছিল না। তাহলে কিসে তাকে বারবার হাযির করেছিল? সেটাই ছিল মুহাম্মাদী আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অনুপম দৃষ্টান্ত।

এভাবে যুগ যুগ ধরে তরুণরাই জাতির পরিবর্তন এনেছে। এমনকি উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তরুণরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একশ্রেণীর বেনিয়া গোষ্ঠীর কারণে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দেখা পেতে ১৯০ বছর সময় লেগেছিল বটে, কিন্তু আন্দোলন সফল হয়েছিল। শাহ ইসমাঈল, সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী, তিতুমীর, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলীর অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম জাতির বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মাওলানা আকরম খাঁর সূচনা করা ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা আন্দোলন তরুণ ছাত্র সমাজ ও বীরসেনানী যুবকদের মাধ্যমেই সফল হয়েছে। মুসলিম চেতনার উপর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বমানচিত্রে ঠাঁই পেয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে জাহেলী যুগের পচা নর্দমায় ফেলে দেয়া হচ্ছে। অসভ্য রাজনীতির নামে পাশ্চাত্যের মুরীদরা ভাস্কর্যের দোহাই দিয়ে মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদির পূজা করাচ্ছে। অন্যদিকে ধর্মের নামে একশ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীরা কবর, মাযার, খানকা, গাছ ইত্যাদির পূজা করাচ্ছে। তরুণরা বৈশাখী সংস্কৃতির নামে কুকুর, শূকর, বানর, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি মূর্তির মুখোশ পরে বেহায়ার মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। ১৪ ফেব্রুয়ারীর 'ভালবাসা দিবস', ১লা ফাল্গুনের 'বসন্ত বরণ' প্রভৃতি দিবসের নামে সমাজের সর্বত্র বেলেল্লাপনার ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর আমেরিকা-বৃটেনের খুদকুঁড়ো খাওয়া একশ্রেণীর বশংবদ মিড়িয়া কর্মী ও সংবাদ মাধ্যম এই নষ্টামিকেই গর্বের সাথে সামাজের সামনে তুলে ধরছে। এভাবে বেহায়াপনার হিংস্র ছোবলে মুসলিম চেতনা ও সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করছে।

দুর্ভাগ্য হল, যে তরুণদের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) যাবতীয় নোংরামি দূর করে সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই তরুণদের মাধ্যমে বর্তমানে নব্য জাহেলিয়াতের আমদানি করা হচ্ছে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীদের মত তাওহীদী চেতনাসম্পন্ন আপোসহীন কাফেলা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত কর্মসূচী আল্লাহ্‌র মদদে বাস্তবায়ন করবেই ইনশাআল্লাহ। নব্য জাহেলিয়াতের দ্বার ভাঙ্গবেই। সেদিন কোন নষ্টামির ঠাঁই হবে না। নমরূদ, ফেরাউন, হামান, কারূণ, আবু জাহালরা দীর্ঘদিন রাজত্ব করলেও তাদেরকে যেমন লাঞ্ছনা নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে, তেমনি নব্য ফেরাউনদেরও একদিন পতন হবে। ইনশাআল্লাহ এদেশে ইসলামের সুমহান আদর্শের পতাকা একদিন পত পত করে উড়বে। আল্লাহ আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করুন-আমীন!!

ক্ষমাসুন্দর আচরণ

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

'আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(বাক্বারা ১০৯)*।

٢- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ-

'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর' *(আলে ঈমরান ১৫৯)*।

٣- فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-

'সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের ভালবাসেন' *(মায়েদা ১৩)*।

٤- وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ–

আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু *(নূর ২২)*।

٥- وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ-

'আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন' *(শূরা ৩০)*।

٦- وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ-

এবং মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না *(শূরা ৪০)*।

٧- وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-

'এবং যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, সেটা তার জন্য নিশ্চয়ই দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(শূরা ৪৩)*।

٨- وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

'আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু' *(তাগাবুন ১৪)*।

١٠- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

'তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক' *(আ'রাফ ১৯৯)*।

١١- قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

'উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল' *(বাক্বারা ২৬৩)*।

١٢- إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا–

'যদি তোমরা ভালো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান' *(নিসা ১৪৯)*।

١٣- وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-

'যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ঈমরান ১৩৪)*।

١٤- وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى–

'আর তোমাদের মাফ করে দেয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর' *(ইবরাহীম ১২)*।

١٥- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ-

'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর কর, তবে তা-ই সবরকারীদের জন্য উত্তম' *(নাহল ১২৬)*।

١٦- وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا–

'আর তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সুন্দর ভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল' *(মুযযাম্মিল ১০)*।

١٧- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا–

'আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ৬৩)*।

হাদীছে নববী থেকে :

١٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দান সম্পদ কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯)*।

١٨–أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وفي رواية إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ



রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি বিষয় আছে যার সত্যতার ব্যাপারে আমি শপথ করতে পারি। ছাদাকার কারণে কখনও সম্পদ হ্রাস পায় না, অতএব তোমরা ছাদাকা কর। কোন ব্যক্তি যুলুমের শিকার হওয়ার পর যদি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন, অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যেই বান্দা ভিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তার অভাব ও দারিদ্র্যের দরজা উন্মুক্ত করে দেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৮৭, সনদ শক্তিশালী)*।

২০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَقُولُ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللَّهُ لَكُمْ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দয়া কর, তাহলে তোমাদের উপরও দয়া করা হবে, তোমরা ক্ষমা কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন' *(আহমাদ, হা/৬৫৪১, ৭০৪১, সনদ হাসান)*।

২১- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) জিহাদরত অবস্থা ব্যতীত কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেন নি। নিজের স্ত্রীদেরকেও না, খাদেমদেরকেও না। কোন ব্যক্তির দ্বারা শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নিজের ব্যাপারে কখনও প্রতিশোধ নেননি, তবে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত কোন বিষয় ভঙ্গ করা ব্যতীত। এটা নিতেন তিনি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৮)*।

২২-عَنْ شَقِيقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ-

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি যেন এখনও রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, যখন তিনি এমন একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তাঁর আপন কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল; আর তিনি নিজের চেহারা হতে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা অজ্ঞ' *(মুত্তাফাক আলাইহ, হা/৫৩১৩)*।

২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মুকাবিলায় পরাভূত করে ফেলে। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, ক্রোধের সময় যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৫)*।

২৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً حَتَّى رَأَيْتُ صَفْحَ أَوْ صَفْحَةَ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَعْطِنِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে মোটা পাড়ের একটি নাজরানী চাদর ছিল। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুঈন তাঁকে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। সেই টানের চোটে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাঁধে দেখলাম চাদরের ডোরা কাটা ছাপ পড়ে গেছে। অতঃপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে যে আল্লাহর মাল আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দাও। রাসূল (ছাঃ) সে বেদুঈনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন এবং তাকে কিছু প্রদানের নির্দেশ দিলেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০৩)*।

২৭- عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : سأل موسى ربه عن ست خصال... فأي عبادك أعزُّ ؟ قال : الذي إذا قَدَرَ غَفَرَ-

২৭. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মূসা (আঃ) তাঁর প্রভুকে ৬টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন... হে প্রভু! আপনার সর্বাধিক ক্ষমতাশালী বান্দা কে? আল্লাহ বললেন, ঐ ব্যক্তি যে (প্রতিশোধ গ্রহণের) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয় *(আহমাদ, ইবনু হিব্বান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫০)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. হাসান (রাঃ) বলেন, মুমিনের সর্বোত্তম গুণ হল ক্ষমাপরায়ণতা *(আল আদাবুশ শারঈয়াহ ১/৭১)*।

২. সাঈদ বিন মুসাইয়েব (র.) বলেন, সকল ব্যাপারে আল্লাহ ক্ষমাকে ভালবাসেন কেবলমাত্র আরোপিত হদ্দ (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি যোগ্য অপরাধ) ব্যতীত।

৩. জনৈক আরব সাহিত্যিক বলেন, ليس الحليم من ظلم فحلم، حتّى إذا قدر انتقم، ولكنّ الحليم من ظلم فحلم حتّى إذا قدر عفا 'সে ব্যক্তি ধৈর্যশীল নয়, যে যুলুমের শিকার হয়ে ধৈর্য ধরে, অতঃপর যখন সুযোগ পায় প্রতিশোধ গ্রহণ করে; বরং সেই ধৈর্যশীল যে যুলুমের শিকার হয়ে ধৈর্যধারণ করে। অতঃপর যখন প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য হয় তখন ক্ষমা করে দেয়'।

৪. ইংরেজীতে বলা হয়- Forgiveness is the economy of the heart... forgiveness saves the expense of anger, the cost of hatred, the waste of spirits অর্থাৎ 'ক্ষমা হল অন্তরের অর্থনীতি। কেননা এটা ক্রোধের ব্যয় সংকোচন করে, ঘৃণা ও বিরাগের খরচ হ্রাস করে এবং কর্মোদ্দীপনার অপচয় প্রতিহত করে'। কেউ বলেন, Forgiveness is the best revenge অর্থাৎ 'ক্ষমা হল সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ'।

৫. উমর (রাঃ) বলেন, " لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرًّا، وأنت تجد لها في الخير محملاً 'তোমার কোন মুমিন ভাইয়ের মুখ থেকে প্রকাশিত কথাকে খারাপ ভাবে নিও না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকে কল্যাণার্থে ধরে নেয়া যায়'।

৬. ইবনু সীরীন (র.) বলেন, إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرًا ، فإن لم تجد فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه 'যখন তুমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে খারাপ কিছু শোন, তবে তার পক্ষে কিছু ওজর খোঁজার চেষ্টা কর, যদি তা না পার, তবে বল, নিশ্চয়ই তার পক্ষে কোন ওজর আছে যা আমি জানি না'।

সারবস্তু

১. ক্ষমাশীলতা উত্তম চরিত্রের অনুপম বহিঃপ্রকাশ।

২. ক্ষমা ঈমানের পূর্ণতা ও ইসলামের সৌন্দর্যের প্রমাণ।

৩. ক্ষমাপরায়ণতা মানুষের অন্তরের প্রশস্ততা, অপরের প্রতি সুধারণা ও মহত্বের প্রমাণ বহণ করে।

৪. ক্ষমা আল্লাহ ও মানুষের প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি করে।

৫. ক্ষমা মানুষকে অনেক দুনিয়াবী ফিৎনা থেকে রক্ষা করে।

৬. ক্ষমাকারী ও ক্ষমাপ্রাপ্ত উভয়ের জন্যই ক্ষমা অনেক কল্যাণ বয়ে আনে।

৭. মানুষকে যে ক্ষমা করতে পারে, আল্লাহ্র কাছেও সে ক্ষমা আশা করতে পারে।

৮. সর্বোপরি ক্ষমা হল আলোর পথ যে পথ মানুষকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভে নিত্য প্রেরণা যোগায়।

তাওহীদে রুবূবিয়াত

-ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স
অনুবাদ : আবু হেনা

তাওহীদের ৩টি প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটি হল তাওহীদে রুবূবিয়াত বা 'স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্‌র এককত্ব'। এই দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে যে, যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দেন; সৃষ্টি থেকে অথবা সৃষ্টির জন্য কোন প্রয়োজন মেটানোর কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ সৃষ্টিজগৎ প্রতিপালন করেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব ও এর অধিবাসীদের একমাত্র প্রভু এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আরবী ভাষায় 'রুবূবিয়াত' শব্দটির মূলধাতু হচ্ছে 'রব' (প্রতিপালক) যা একই সাথে সৃষ্টি ক্ষমতা এবং প্রতিপালন উভয় গুণের পরিচয় বহন করে।

এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটাতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টিজগতে কিছুই ঘটে না। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি স্বরূপ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রায়ই 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন বিচলন অথবা ক্ষমতা নেই) বলে বিস্ময়সূচক উক্তি করতেন।

কুরআনের বহু আয়াতে রুবূবিয়াত আক্বীদার ভিত্তি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ–আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা' *(যুমার ৬২)*। 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাও' *(ছাফফাত ৯৬)*। 'এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহই করেছিলেন' *(সূরা আনফাল ১৭)*। 'আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না *(সূরা তাগাবুন ১১)*।

রাসূল (ছাঃ) এই ধারণার আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'সাবধান, যদি সমস্ত মানবজাতি তোমাকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চায়, তারা শুধু অতটুকুই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন। অনুরূপ, যদি সমস্ত মানব জাতি ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তারা শুধু ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২)*।

কাজেই মানুষ যা সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য বলে ধারণা করে তা শুধুমাত্র এই জীবনের পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষার অংশ। আল্লাহ যেভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেভাবেই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের (কিছু) শত্রু রয়েছে; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সর্তক থাকো' *(সূরা তাগাবুন ১৪)*।

অর্থাৎ মানুষের জীবনের ভাল জিনিসের মধ্যেও আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা নিহিত আছে। অনুরূপভাবে জীবনের কঠিন ও ভয়াবহ ঘটনাবলীতেও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে; যেমন আয়াতে উল্লেখ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও' *(সূরা বাক্বারা ১৫৫)*।

কখনও কখনও জীবনের ঘটনাগুলো উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা সহজ, যখন কার্যকারণ অনুযায়ী ফলাফল ঘটে। আবার কখনও উপলব্ধি করা কঠিন, যখন আপাতঃদৃষ্টিতে মন্দ কাজের সুফল অথবা ভাল কাজ থেকে খারাপ ফল আসে। আল্লাহ বলেন, সীমিত জ্ঞানের জন্যে এই ধরনের আপাতঃ অনিয়মের পেছনে কি বিজ্ঞতা রয়েছে তা মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাইরে। আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তোমরা যা পসন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের কাছে অকল্যাণকর' *(সূরা-বাকারা ২১৬)*।

মানুষের জীবনে আপাতঃ অকল্যাণকর ঘটনা কখনো শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয় এবং আপাতঃ কল্যাণকর জিনিস যা মানুষ পছন্দ করে তা শেষ পর্যন্ত অকল্যাণকর হয়। জীবনে যে সব সুযোগ আসে তা থেকে পছন্দ করে জীবন গড়ার মধ্যেই মানুষের প্রভাব সীমাবদ্ধ–সুযোগের প্রকৃত ফলাফলের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। অন্য কথায়–'মানুষ প্রস্তাব করে, স্রষ্টা নিষ্পত্তি করে'। 'সৌভাগ্য' এবং 'দুর্ভাগ্য' (সবই আল্লাহ প্রদত্ত এবং বিভিন্ন তাবিজ-কবচ ও কুসংস্কার (যেমন-খরগোশের পা, এক বোঁটায় চার পাতা বিশিষ্ট ছোট গাছ, ইচ্ছা পূরণ করার হাড়, ভাগ্যবান সংখ্যা, রাশিচক্র ইত্যাদি) অথবা অশুভ সংকেত (যেমন-১৩ তারিখের শুক্রবার, আয়না ভাঙ্গা, কালো বিড়াল) দ্বারা এসব সংঘটিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যাদু এবং শুভ-অশুভ সংকেতে বিশ্বাস করা শিরক (তাওহীদে রুবূবিয়াত পরিপন্থী) এবং একটি কঠিন গুনাহ। উক্ববা (রাঃ) বলেন যে, 'একদিন একদল লোক আনুগত্য প্রকাশের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আগমন করলে তিনি একজন বাদে অপর নয়জনের শপথ গ্রহণ করলেন। যখন তারা জিজ্ঞাসা করল, কেন তিনি তাদের সঙ্গীর শপথ গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'যথার্থই, সে মন্ত্রপুত কবচ (এক ধরনের তাবিজ) পরে আছে। যে লোকটি মন্ত্রপুত কবচ পরে ছিল সে তার আলখেল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কবচটি বের করে ভেঙ্গে ফেলল এবং তারপর শপথ পড়ল। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, 'যে কেউ মন্ত্রপুত কবচ পরবে সে শিরক করবে *(আহমাদ, হা/১৭৪৫৮, সনদ শক্তিশালী)*।

কুরআনকে মন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা অথবা শয়তানকে সরিয়ে রাখার জন্য অথবা সৌভাগ্য আনার জন্য তাবিজ হিসাবে কুরআনের আয়াত গলার হারে পরা অথবা থলির মধ্যে রাখার প্রথা এবং পৌত্তলিক প্রথার মধ্যে খুব কমই পার্থক্য বিদ্যমান। রাসূল (ছাঃ) কিংবা তাঁর সাহাবাগণ কোরআনকে এভাবে ব্যবহার করেননি এবং রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কেউ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন নতুন কিছু প্রচলন করবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। এটা সত্যি যে, পবিত্র কুরআনের সূরা নাস এবং ফালাক সূরা দু'টি নির্দিষ্টভাবে জাদুর প্রভাব দূর (অর্থাৎ মন্দ জাদুমন্ত্র দূর) করার জন্য নাযিল হয়েছিল, কিন্তু সঠিক কি পদ্ধতিতে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে তা রাসূল (ছাঃ) দেখিয়ে গেছেন। একদা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর বাণ মারা হলে তিনি আলী ইবনে আবু তালিবকে এই দু'টি সূরার প্রতিটি আয়াত পড়তে বলেছিলেন এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজের উপর সেগুলি নিজেই পড়তেন। তিনি সূরাগুলি লিখে তাঁর গলায় ঝুলাননি, হাতে অথবা কোমরে বাঁধেননি অথবা তিনি অন্য কাউকে এসব করতে বলেননি।

তাওহীদে রুবূবিয়াতের শিরক :

তাওহীদুর রুবূবিয়াতের বিরোধী বিষয়টিই হ'ল তাওহীদে রুবূবিয়াতের শিরক। এর দ্বারা বোঝায়–

১. অন্যেরাও আল্লাহর সমকক্ষ অথবা সমকক্ষের কাছাকাছি এবং তার সৃষ্টি কর্তৃত্বের অংশীদার। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মীয় মতবাদ রুবূবিয়াতে শিরকের এই রূপের অন্তর্গত।

২. স্রষ্টার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। কিছু কিছু দার্শনিকগণের দর্শন চর্চায় এই ধরনের নাস্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দুইভাবে এই শিরক সংঘটিত হতে পারে–

ক) সম্পৃক্ততার বা অংশীদারিত্বের দ্বারা শিরক :

যে সব বিশ্বাস এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা হল সৃষ্টিজগতের উপর যে একজন প্রধান স্রষ্টা অথবা সর্বোচ্চ সত্তা বিদ্যমান তা স্বীকৃত, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্রতর দেবদেবতা, মানুষ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অথবা পার্থিব সামগ্রী ও তার রাজত্বের সঙ্গে অংশীদারীত্ব করে। এই ধরনের বিশ্বাসকে ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ এবং দার্শনিকগণ সাধারণভাবে এককত্বের দর্শন (একসৃষ্টার অস্তিত্বে) অথবা বহু ঈশ্বরবাদে (একের বেশী স্রষ্টার) বিশ্বাসী বলে উল্লেখ করে থাকেন। ইসলামী মতে, এই ধরনের সব বিশ্বাসই বহু ঈশ্বরবাদ। এই ধরনের বিকৃত বিশ্বাসের অনেকগুলি স্বর্গীয়ভাবে প্রেরিত ধর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রার অধঃপতনের প্রতিনিধিত্ব করে, অথচ এই সব বিশ্বাস শুরুতে তাওহীদ ভিত্তিক ছিল। হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ সত্তা ব্রহ্মাকে অন্তর্যামী, সর্বপরিব্যাপক, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন, নৈর্ব্যক্তিক অসীমের নির্যাস হিসাবে কল্পনা করা হয়। তার মধ্য হতে সবকিছুর সূত্রপাত এবং সমাপ্তি। ব্রহ্মা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যিনি সংরক্ষক দেবতা বিষ্ণু এবং ধ্বংসের দেবতা শিবকে নিয়ে ত্রিত্ব (Trinity) গঠন করে। এভাবে হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার গঠনমূলক, ধ্বংসাত্মক ও সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং অন্যান্য দেবদেবতার উপর অর্পণকেই রুবূবিয়াতে শিরক প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

খৃষ্টীয় ধর্মমতে, পিতা, পুত্র (যিশুখৃস্ট) এবং পবিত্র আত্মা এই তিন জনের মাধ্যমে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করে। তথাপি এই তিনজনকে একই বস্তুর অংশীদার হিসাবে একক বলে গণ্য করা হয়। পয়গম্বর যিশুকে দেবত্বে উন্নীত করা হয়েছে যিনি স্রষ্টার ডান হাতে বসেন এবং পৃথিবীর বিচার কার্য পরিচালনা করেন। হিব্রু বাইবেলে স্রষ্টা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তার সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং খৃষ্টীয় মতবাদ হিসাবে তিনি দেবত্বের অংশ। পল (Paul) পবিত্র আত্মাকে (Holy Spirit) খৃষ্টের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, পথ প্রদর্শক খৃস্টানদের সাহায্যকারী হিসাবে ঘোষণা করে এবং পেনিকস্ট (Penecost) এর দিনে পবিত্র আত্মা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে যিশু এবং পবিত্র আত্মা স্রষ্টার সকল পবিত্র আত্মা স্রষ্টা আধিপত্যের অংশীদার যিশু আধিপত্যের অংশীদার, যিশু একই বিশ্বাসের উপর রায় ঘোষণা করেন এবং খৃষ্টানগণ পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পথপ্রদর্শিত হয়। এই সব খৃষ্টীয় বিশ্বাসের মধ্যমে রুবূবিয়াতে শিরক ঘটে।

পারস্য অগ্নিপূজারীরা (Zoroastrians) তাদের স্রষ্টা 'আহুরা মাজদা' সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি যা কিছু ভাল তারই নির্মাতা এবং তিনি একমাত্র প্রকৃত উপাসনার যোগ্য। আহুরা মাজদার সাতটি সৃষ্টির মধ্যে অগ্নি একটি, যাকে তার পুত্র অথবা প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়। আংগ্রা মাইনু (Angra Mainyu) নামের অপর একজন দেবতা–অন্ধকার যার প্রতীক, তার দ্বারা শয়তানী হিংস্রতা, মৃত্যু সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের কল্পনার বশবর্তী হয়ে তারা রুবূবিয়াতে শিরক করে।

কাজেই মন্দ গুণাবলী স্রষ্টার উপর আরোপ করার মানসিক ইচ্ছার কারণে পাপী আত্মাকে একজন বিরোধী দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে সকল সৃষ্টির উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার (অর্থাৎ তাঁর রুবূবিয়াতের) অংশীদার করা হয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় (প্রধানতঃ নাইজেরিয়া) ইয়োরুবা (Yoruba) ধর্মের অনুসারী এক কোটিরও বেশি লোকদের বিশ্বাস ওলোরিয়াস (Olorius অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি) অথবা ওলোডুমেয়ার (Olodumare) নামে একজন সর্বপ্রধান স্রষ্টা রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক 'ওরিশা' (Orisha) উপাসনা দ্বারা আধুনিক ইয়োরুবা ধর্ম চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে ইয়োরুবা ধর্ম কট্টর বহু-ঈশ্বরবাদ বলে মনে হয়। কাজেই ছোটখাট দেবতা এবং আত্মাদের উপর স্রষ্টার সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ইয়োরুবা ধর্ম অনুসারীগণ রুবূবিয়াতে শিরক করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায় এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী, যার নাম আনকুলুনকুলু (Unkulunkulu) অর্থ প্রাচীন সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে সম্মানিত। স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট মুখ্য উপাধিগুলো হ'ল এনকোসী ইয়াপজুলু (Nkosi yaphezulu অর্থ আকাশের স্রষ্টা) এবং আমভেলিংকানকী (Umvelingqanqi অর্থ সর্বপ্রথম আবির্ভূত)। তাদের সর্বপ্রধান স্রষ্টাকে একজন পুরুষ হিসাবে গণ্য করা হয়, যিনি পার্থিব মহিলার সাহায্যে মানুষ্যজগৎ সৃষ্টি করে। জুলু ধর্মের মতে, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানো স্রষ্টা প্রদত্ত। পক্ষান্তরে অসুস্থতা এবং জীবনের অন্যান্য বিপদ-আপদ ইডলোজী (Idlozi) অথবা আবাপহানসি (abaphansi অর্থ যেগুলি মাটির নীচে) নামের পূর্বপুরুষ কর্তৃক সংঘটিত হয়। এই সব পূর্বপুরুষগণ জীবিতদের নিরাপত্তা বিধান করে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করে এবং আচার-অনুষ্ঠান ও বলিদানে সন্তুষ্ট হয়, অমনোযোগীদের শাস্তি প্রদান করে এবং জ্যোতিষীদের (in-yanga) নিয়ন্ত্রণে রাখে। এভাবে শুধুমাত্র মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের মতবাদের জন্যই নয়, মানুষের জীবনে ভাল-মন্দ ঘটা তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার কাজ বলে আরোপিত করার কারণেই জুলু ধর্মে রুবূবিয়াতে শিরক সংঘটিত হয়।

কিছু মুসলিমদের মধ্যে রুবূবিয়াতে শিরক এই ধরনের বিশ্বাসে প্রকাশিত হয় যে ওলী-আওলিয়া এবং অন্যান্য বুজুর্গ ব্যক্তিগণের আত্মা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও জাগতিক ঘটনাবলীতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এই সব আত্মা একজনের চাহিদা পূরণ করতে, বিপর্যয় দূর করতে এবং যারাই তাদের স্মরণ করবে তাদেরই সাহায্য করতে সক্ষম। সুতরাং কবরপূজারীগণ এই জীবনের ঘটনাবলী সংঘটিত হবার জন্য মানুষের আত্মার উপর স্বর্গীয় ক্ষমতার উপস্থিতি প্রমাণ করে, যা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহই ঘটাতে পারেন।

বহু সূফীদের (মরমীবাদী মুসলিম) মধ্যে সাধারণভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে 'রিজালুল গায়েব'দের' মধ্যে যিনি প্রধান তিনি কুতুব নামক স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তার দ্বারা এই পৃথিবীর বিষয়াদী নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ) অস্বীকৃতির দ্বারা শিরক :

বিভিন্ন দর্শন এবং ভাবাদর্শ যেগুলি সুনির্দিষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, এই উপশ্রেণীতে তারই আলোচনা হবে। অর্থাৎ কতিপয় ক্ষেত্রে স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতার (নাস্তিকতা বা Atheism) ঘোষণা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে কতিপয় ক্ষেত্রে তার

---

১. আক্ষরিক অর্থে "অদৃশ্য জগতের মানুষ"। "নিবারিতকারী" (দুর্ঘটনা এড়ানোকারী) সন্তদের বা আউলিয়াদের মধ্যবর্তিতার কারণে এই পৃথিবী টিকে থাকার কথা এদের সংখ্যা অপরিবর্তিত এবং একজনের মৃত্যুতে তাৎক্ষণিকভাবে আরেকজন দিয়ে তার স্থান পূরণ হয়ে যায়। (Shorter Encyclopedia of Islam pp 582).

অস্তিত্বের দাবী করা হলেও যেভাবে তাকে কল্পনা করা হয়, তাতে প্রকৃতপক্ষে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় (হতাশাবাদ বা Patheism)।

কিছু প্রাচীন ধর্মীয় তন্ত্র আছে যার মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। এদের মধ্যে অন্যতম হল গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত তন্ত্র। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ণপ্রথার বিরোধিতাকারী একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসাবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই সময়ে জৈন ধর্মের প্রচলন শুরু হয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে চালু হয়। অবশেষে এটা হিন্দু ধর্ম কর্তৃক অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং বুদ্ধকে অবতারদের (স্রষ্টার প্রতিমূর্তি) মধ্যে একজন গণ্য করা হয়। ভারতে এই ধর্মের প্রভাব কমে আসলেও চীন এবং অন্যান্য পূর্বের দেশগুলোতে প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের দু'ধরনের ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয়। ঐ দুই ব্যাখ্যার মধ্যে প্রাচীনতর হিনযান (Hinayana) বৌদ্ধ ধর্ম (৪০০-২৫০খৃঃপূঃ) পরিস্কার করে দেয় যে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই। সেজন্য ব্যক্তি বিশেষের পরিত্রাণ লাভের দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায়। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ধারাকে রুবূবিয়াতে শিরকের উদাহরণ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়, যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে জৈন ধর্মের শিক্ষক ভারধামানা (Vardhamana) প্রচার করে যে স্রষ্টা বলে কিছুই নেই, তবে মুক্ত আত্মা অমরত্ব এবং অসীম জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার পদমর্যাদার কিছু অংশ অর্জন করে। ধর্মীয় সমাজ এমনভাবে এসব তথাকথিত মুক্তআত্মাদের সঙ্গে আচরণ করে যেন তারা দেবতাসুলভ, তাদের জন্য মন্দির নির্মাণ করে এবং তাদের মূর্তি পূজা করে।

আরেকটি প্রাচীন উদাহরণ হল পয়গম্বর মূসার সময়কালের ফেরাউন। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, ফেরাউন আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং মূসা ও মিসরের জনগণের কাছে দাবী করেছিল যে, সে সকল সৃষ্টির একমাত্র সত্যিকার প্রভু। সে মূসাকে বলেছিল বলে আল্লাহ উল্লেখ করেন, "তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব' *(শু'আরা ২৬-২৯)* এবং জনগণকে বলেছিল "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক' *(নাযি'আত ২৪)*।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যা 'স্রষ্টার মৃত্যু দর্শন' (death of God philosophy) নামে পরিচিতি লাভ করে। জার্মান দার্শনিক ফিলিপ মেইনল্যান্ডার (Philpp Mainlander ১৮৪১-১৮৭৬) তাঁর The Philosophy of Redemption ১৮৭৬ (প্রায়শ্চিত্ব করার দর্শন) শীর্ষক বইতে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু বিশ্বের একাধিকত্বে স্রষ্টার এককত্বের মূল উপাদান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পরমানন্দের তত্ত্বকে শান্তিভোগতত্ত্ব (যা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান) দিয়ে অস্বীকার করা হয়েছে, সেহেতু স্রষ্টার মৃত্যুর পর বিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রুশিয়ার ফ্রেড্রিক নিটশে (Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900) 'স্রষ্টার মৃত্যু' মতবাদ সমর্থন করে উপস্থাপন করেছিলেন যে, স্রষ্টা মানুষের অস্বস্তিকর বিবেকের অভিক্ষেপ (Projection) ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং মানুষ অতি মানবের (Superman) সঙ্গে সেতুবন্ধন ছিল। বিংশ শতাব্দীতে জাঁ পল সার্তে (Jean Paul Sarte) নামে একজন ফরাসী দার্শনিকও 'স্রষ্টার মৃত্যু' চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করেন। তিনি দাবী করেন যে, স্রষ্টা বিদ্যমান থাকতে পারে না। কারণ তিনি পরস্পর বিরোধী শব্দ সম্বলিত একটি উক্তি। তার মতে স্রষ্টা শুধু মানুষের কল্পনার তৈরী নিজস্ব অভিক্ষেপ (Projection)।

মানুষ মহিমান্বিত বানর ছাড়া কিছুই নয়-ডারউইনের (মৃত-১৮৮২) এই প্রস্তাব সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। কারণ এই তত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতার 'বৈজ্ঞানিক' ভিত্তি রচনা করে। তাদের মতে, সর্বপ্রাণবাদ (animism) হতে একেশ্বরবাদ ধর্মের সূচনা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হতে মানুষের সামাজিক বিবর্তন এবং বানর হতে দৈহিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি। কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং অস্তিত্বহীনতা (বা শূন্যতা) থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়-এই অমূলক দাবীর মাধ্যমেই তারা সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এভাবেই তারা আল্লাহ্র আদি এবং অন্ত হীনতা মানুষের উপর আরোপ করে। আধুনিককালে এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ কার্ল মার্কসের (Karl Marx) অনুসারী সাম্যবাদী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকগণ। এরা দাবী করে গতিশীল পদার্থই বিদ্যমান সকল বস্তুর উৎস। তারা আরও দাবী করে যে, নির্যাতিত জনগোষ্ঠী যে বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক মানুষের কল্পনার স্রষ্টাকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

কিছু মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের শিরকের একটা উদাহরণ হল ইবনে আরাবীর মত বহু সূফী যারা দাবী করে যে, একমাত্র আল্লাহই অস্তিত্বমান (সবই আল্লাহ এবং আল্লাহই সব)। তারা আল্লাহর পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ইহুদী দার্শনিক বারুচ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) এই ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছিল। তার মতে মানুষসহ বিশ্বের সকল অংশের সমষ্টিই হল স্রষ্টা।

দশটি জিনিস নিষ্ফল বিষয় :

১. **এমন জ্ঞান,** যার কোন কার্যকারিতা নেই।
২. **এমন কর্ম,** যার মাঝে কোন খুলুছিয়াত নেই, নেই রাসূলের অনুসরণ।
৩. **এমন ধন-সম্পদ,** যা ব্যয় করা হয় না। ফলে দুনিয়াতেও তা ভোগ করা যায় না, আখেরাতের জন্যও তা সঞ্চিত থাকে না।
৪. **এমন অন্তর,** যাতে আল্লাহ্র ভালোবাসা থাকে না, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা থাকে না, তাঁর নৈকট্য লাভেরও কোন উদ্দেশ্য থাকে না।
৫. **এমন শরীর,** যা আল্লাহ্র আনুগত্যও করে না, আল্লাহ্র দেয়া কর্তব্যও পালন করে না।
৬. **আল্লাহ্র প্রতি এমন ভালোবাসা,** যে ভালবাসায় আল্লাহ্কে খুশী করার কোন প্রচেষ্টা থাকে না, তাঁর নির্দেশাবলী পালনের কোন তাকীদ থাকে না।
৭. **এমন সময়,** যা পাপমুক্তির লক্ষ্যে কিংবা পূণ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হয় না।
৮. **এমন চিন্তা-ভাবনা,** যা অর্থহীন বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়।
৯. **এমন ব্যক্তির খেদমতে সময় দেয়া,** যার খেদমত আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে না এবং দুনিয়াবী কোন উপকারেও আসে না।
১০. **এমন ব্যক্তিকে ভয় করা বা তার নিকট কিছু প্রত্যাশা করা,** যে নিজেই আল্লাহ্র অনুগ্রহের ভিখারী ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। যে না পারে নিজেকে রক্ষা করতে, না পারে নিজের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে, আর না পারে নিজের জীবন-মৃত্যু বা পুনরুত্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

(ইবনুল কাইয়েম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১১১-১১২)।

শিশুদের নিরাপত্তাবিধানে ইসলাম

-বযলুর রহমান

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন ছাড়া জগত সংসারের গতি নিস্প্রভ। সমাজ, সভ্যতা ও পরিবেশের সাথে সুসামঞ্জস্য ও নিরবচ্ছিন্নভাবে খাপ খেয়ে চলাই সমাজবদ্ধ জীবনের মৌলিক দাবী। আর সমাজের মূল রূহ হ'ল পরিবার। পরিবার গঠিত হয় মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অপরূপ সৃষ্টিকৌশলের মাধ্যমে। আর তা হ'ল নিষ্কলংক বিমল পুষ্পের মত ভালবাসাময় পবিত্র দাম্পত্য জীবন। যা একজন পুরুষ ও নারীর বৈধ সম্পর্কের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যায়ন। একপর্যায়ে তাদের এই বৈধ সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরে পৃথিবীর আলো বাতাসে আগমন করে নতুন অতিথি। আনন্দের হিল্লোল খেলে যায় পিতা-মাতার হৃদয়ের গভীরে। যেন রাজ্যের সমস্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। শুরু হয় সদ্য প্রসূত অতিথিকে ঘিরে নতুন পথের নব যাত্রা। নতুন সাজে সজ্জিত হয় পিতা-মাতার হৃদয়ে জমে থাকা সমস্ত আশা-আকাংখার। স্বপ্ন দেখে হাজারো রকমের। উৎফুল্লতা আর আত্মতৃপ্তির এই সুখকর সংবাদ আত্মপ্রকাশ করে হাস্যজ্জল চেহারায় স্বগৌরবে। তারপর আরম্ভ হয় আরেক যুদ্ধ। সন্তানকে একজন সৎ, আদর্শবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার। এই যুদ্ধে কেউ বিজয়ীর জয়মাল্য পরিধান করে চির শান্তির নিদ্রায় শায়িত হয়। আবার কেউ পরাজয়ের গ্লানি টানতে টানতে এক সময় মৃত্যু তার উপর জয়লাভ করে। আর এটাই এই জগত সংসারের স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ।

শিশুরা মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ। ইসলামী জীবন দর্শনে মানব সন্তান তথা মানবশিশু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নে'য়ামত। পিতা-মাতার চোখ জুড়ানো ধন। মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং বিশ্ব মানবতার সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। সেজন্য শিশুর নিরাপত্তা বিধান, অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলাম আপোষহীন। ইসলাম মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, লালন-পালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মেধা, মনন, আত্মা ও পরিবেশের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ প্রদান তাদের সুসামঞ্জস্য জীবনের অন্যতম নিদর্শন। এই সুসামঞ্জস্য জীবন গঠনের কারিগর হলেন পিতা-মাতা। একজন মুসলিম পিতা-মাতার অত্যাবশ্যক কর্তব্য হল, সন্তান প্রতিপালনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কালজয়ী আদর্শ গ্রহণ করা। তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর জগতে ঢুকিয়ে দেওয়া। অতঃপর তাদের মধ্যে ইসলামী জীবন দর্শনের বীজ বপন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক তার বিধানাবলী প্রচার-প্রসারের জাযবা তৈরীর মাধ্যমে জীবনকে পত্র-পল্লবে সুশোভিত করার শিক্ষা প্রদান করা। সাথে সাথে মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে নিজের সন্তানকে যাবতীয় কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য সঠিক ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দক্ষ প্রশিক্ষকের নিকটে ইসলামী তামুদ্দনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যাতে করে সে নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করতে পারে। পরিশেষে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য বিশুদ্ধ ও আদর্শিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের অন্তরে সামাজিক দায়িত্ববোধের সমন্বয় সাধন করা। যা বিরাজমান যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে সহায়ক হবে। সমাজ সংস্কারের জন্য তার মধ্যে একজন বীরযোদ্ধাস্বরূপ দুর্দমনীয় শক্তি ও সাহসের বীজ রোপিত হবে। এভাবে ভারসাম্যহীন ভোগবাদিতা ও লাগামহীন দুর্নীতির অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করে শিশুর সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বচ্ছ বারিধারায় সিঞ্চিত করে কলুষযুক্ত জীবনচরণে অভ্যস্ত করাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার একান্ত দায়িত্ব। যা সঠিকভাবে অনুসরণ, অনুকরণ ও যথাযথ পালনের মাধ্যমে সমাজে অন্যায়-অত্যাচার ও অশান্তির উপাদানগুলো অপসৃত হবে। শান্তির সুখময় পরিবেশ বিরাজ করবে সমাজের আনাচে কানাচে। মানুষ ফেলতে পারবে অফুরন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস। নিম্নে শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের ভূমিকা আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ্।

শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের গুরুত্ব :

আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নে'য়ামতের মধ্যে সন্তান-সন্ততি একটি বড় নে'য়ামত। এই নে'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ খুশি হন। আর তাদের জন্য পিতা-মাতার দো'য়া আল্লাহ কবুল করে থাকেন।

পিতা-মাতার নিকট সন্তান-সন্ততি এক অমূল্য সম্পদ। এই অমূল্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা পিতা-মাতার উপর নৈতিক দায়িত্ব। কেননা একদিকে সন্তান-সন্ততির কার্যক্রম পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করে, অন্যদিকে কোন সময় তাদের জন্য ক্ষতিকর বস্তুতেও পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্বরণ থেকে ধ্বংস না করে। আর যদি এরূপ হয় তাহ'লে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মুনাফিকূন ১০৪/৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন যে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. 'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল ও ছাওয়াবের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকার আমলের ছাওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকে। যথা ১. সাদকায়ে জারিয়া ২. এমন ইলম বা জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। ৩. সুসন্তান, যে তার জন্য (তার মৃত্যুর পর) দো'আ করে *(মুসলিম হা/৪৩১০; আবুদাঊদ হা/২৮৮০; তিরমিযী হা/১৩৭৬)*। উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৎচরিত্রবান, উপকারী সুসন্তান পিতা-মাতার স্থায়ী সম্পদ। যার কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। সন্তানকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে মৃত্যুর পরেও কবরে অবস্থান কালে ছাওয়াব পাওয়া যায়। আবার কর্তব্য পালনে অবহেলার কারণে যদি সন্তান কুসন্তান হয় তাহ'লে সেখানে নিশ্চিত কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

নেতৃত্বশূন্য ও অশান্ত এ পৃথিবীতে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও শান্তির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে শিশুদের সুষ্ঠ বিকাশ ও সঠিক নিরাপত্তা বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আর তার প্রথম ধাপ হ'ল পরিবার। কেননা পরিবার হ'ল একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাথমিক কাঠামো। আর পরিবারই একটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেখানে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকেন পিতা ও মাতা। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশের পথে পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কারণ শিশুর যাবতীয় দৈহিক, মানসিক, বস্তুগত ও অবস্তুগত প্রয়োজন মিটায় পরিবার। পরিবারেই শিশু তার চিন্তা, মনন, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। মূলতঃ শিশুর চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয় পরিবারেই। সমাজের একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে পরিবার যদি তথাকথিত আধুনিক নষ্ট সভ্যতার পুচ্ছধারী হয়, অপসংস্কৃতির লালনকারী হয়, অবসর সময়কে আড্ডাবাজী, গান-বাজনা, টিভি-সিনেমা ইত্যাদির মাঝে অতিবাহিত করে। তাহ'লে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব একটি শিশুকে

প্রভাবিত করে অতি দ্রুত। ফলে তার সামনে স্বচ্ছ আদর্শ বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। যা বর্তমানে হরহামেশাই ঘটছে।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট নিরেপক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে আরও ভয়াবহ দৃশ্য ফুটে উঠবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ভিন্নতা, পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্কের টানা-পোড়েন, ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, ঘুষখোর পিতার অগাধ লোভ ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ততা, নেশাগ্রস্ত পিতার উন্মত্ততা, সামাজিক বন্ধনে ফাটল, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী পারিবারিক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় অনুশীলনের অনুপস্থিতি প্রভৃতি একটি শিশুকে তাড়া করে ফিরছে প্রতিনিয়ত। ফলে অনেক আশা থাকা সত্ত্বেও এ সকল ভয়াবহতা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারছে না সচেতন (?) অভিভাবকমণ্ডলী।

মুসলিম সমাজের চিত্র অবলোকন করলে আরো দৃষ্টিগোচর হয় যে, বিজাতীয় সভ্যতার নোংরা আক্রমণ ছেয়ে ফেলেছে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে। আধুনিকতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সাথে সাথে বাংলার শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার হিংস্র ও ধ্বংসাত্মক ঢেউ লেগেছে। ফলে এমন কোন ঝুপড়ি নেই যেখানে টিভি-সিডি নেই। যা গোগ্রাসে গিলছে এদেশের কচি-কাঁচা সোনামণিরা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ৫-৭ বছরের ছোট্ট বাচ্চাদের হাতেও শোভা পাচ্ছে ভিডিও মোবাইল। যার মাধ্যমে তারা পরিচিত হচ্ছে হাজারো অপসংস্কৃতির সাথে। এজন্য বর্তমানে শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য যেকোন সময়ের চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। নিম্নে বর্তমান সমাজে শিশুদের ভয়াবহ পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রামাণিক কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ্।

কেস-স্টাডি

ক. আড়াই বছরের ছোট্ট মেয়ে। বাবলা গাছের নিচে বসিয়ে রেখে মা গেছে পাশের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে। পাশের বাড়ির ধনীর পাষণ্ড ছেলে এসে তাকে ফুসলিয়ে নিকটস্থ এক পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। ছোট্ট মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসে ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। ছোট্ট মেয়েটি ভয় ও কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে, 'মা! তুমি ঐখানে যেওনা। ঐখানে ভূত আছে। ভূত কামড়িয়ে দিবে। আমাকে কামড়িয়ে দিয়েছে।' ছোট্ট অবুঝ শিশু। কিছুই বোঝেনা। মা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে। এই নির্যাতিত শিশুর অসহায় গরীব মায়ের গগণবিদারী আর্তনাদ সেদিন আকাশ বাতাস ভারি করে তুলেছিল। এভাবে কত অসহায় মা-বোন এই বাংলার যমীনে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে! *(দৈনিক আমার দেশ, মার্চ ২০১০)*।

খ. পিতা-মাতা উভয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার সময়ে একমাত্র পুত্রকে ঘরে রেখে যান টিভি চালু করে দিয়ে। ফিরে এসে ডাকাডাকি করেও ছেলের সাড়া না পাওয়ায় অবশেষে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখা গেল কিশোর ছেলেটির লাশ মায়ের উড়না গলায় পেঁচিয়ে ফ্যানের নিচে ঝুলছে। সামনে টিভিতে তখনও ভারতীয় ছবি চলছে। সেখানে দেখানো ফাসির দৃশ্যের অনুকরণ করতে গিয়ে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হারিয়ে গেল চিরদিনের মত। ঢাকা মহানগরীর এই ঘটনাটি ২০০৮ সালের।

পরিস্থিতির মূল্যায়ন

শিশুরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের তার কিছু চিত্র নিম্নরূপ :

ক. সামাজিক আগ্রাসন : আমেরিকায় টিভির ব্যবহার ও তার প্রভাব বিষয়ক সেদেশের একটি রিপোর্টে জানা যায় যে, সেদেশের ৯৬% পরিবারে অন্তত একটি টিভি সেট রয়েছে। সেদেশে তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা সপ্তাহে গড়ে ৫০ ঘন্টা টিভি দেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্ররা টিভির সামনে বসে পার করে দেয় ২২০০০ ঘন্টারও বেশী সময়। অথচ স্কুলে সময় কাটায় মাত্র ১১০০০ ঘন্টা। টিভিতে অধিকহারে সন্ত্রাস দেখানোর ফলে তারাও সন্ত্রাসী ও বিধ্বংসী হয়ে উঠে *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছবি ও মূর্তি, পৃষ্ঠা ৭)*।

মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী গত এপ্রিল মাসে কন্যা-শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়েছে। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে মোট ৬৩ জন নারী এবং কন্যা-শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ২৪ জন নারী ও ৩৯ জন কন্যা-শিশু। এর আগে ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট তিন মাসে ৩৯ জন কন্যা-শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। তিন মাসে যা হয়েছে এপ্রিল মাসেই হয়েছে তার অর্ধেক। এপ্রিলে ২৪ জন নারীর মধ্যে ৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৩৯ জন কন্যা-শিশুর মধ্যে ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে *(দৈনিক আমার দেশ, মে ২০১০, পৃষ্ঠা ১১)*। 'অধিকার' অনুসন্ধানে আরো দেখেছে, ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে ১২২ জন নারী ও কন্যা-শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৩ জন প্রাপ্ত বয়স্কা নারী এবং ৬৯ জন কন্যা-শিশু। ৫৩ জন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর মধ্যে ১১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ২৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৬৯ জন কন্যা-শিশুর মধ্যে ধর্ষণের পর ৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ২৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে *(প্রাগুক্ত)*।

এছাড়া দেশময় রাজনৈতিক অস্থিরতা, পাশবিকতার তাণ্ডব নৃত্য, ক্ষমতাসীন দলের দৌরাত্ম্য, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, দুর্নীতির কালোহাত, অপসংস্কৃতির ভয়াল রূপ, জঙ্গীবাদের উত্থান, আধুনিকতার নামে চরিত্র বিধ্বংসী আধুনিক প্রযুক্তির হিংস্র আক্রমণ, রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার বিরোধী আন্দোলন, ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারী অপতৎপরতা, ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালুকরণ, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বৈধতা প্রভৃতি চলমান প্রেক্ষাপট জাতিকে ধ্বংসের অগ্নিরাজ্যে পরিণত করেছে। অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যেন মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

খ. পেশাগত আগ্রাসন :

অন্যদিকে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের কায়িক শ্রমের বিষয়টি এখন পরিণত হয়েছে ডালভাতে। এক বিভীষিকাময় কর্মক্লান্ত জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে হচ্ছে শিশু শ্রমিকদের। সেখানে তারা ফুলের মত জীবনকে নিঃশেষ করে দেয় অবলীলাক্রমে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর উদ্যোগে ২০১০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত 'শিশু দারিদ্র ও বৈষম্য'-বিষয়ক একটি গবেষণা শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট শিশুর সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লাখ। এদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বেসরকারী সংস্থা 'Save the children' পরিচালিত অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বর্তমানে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৭৪ লাখ শিশুই সরাসরি শিশু শ্রমের সংগে জড়িত। তাদের কাজের শতকরা ৯৯ ভাগই কমবেশী ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় ৪০ শতাংশ শিশুরই প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ ঘন্টা করে কাজ করতে হয় *(ইত্তেফাক, ১৫ই জুন ২০১০, পৃ. ১০)*। দু'টি বেসরকারী সংস্থার শিশু জরীপ থেকে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলে স্কুলে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা চার লাখের উপরে। ৬ বছর থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর মধ্যে ১৫ হাজার শিশু শ্রম বিক্রি করে। ১০ বছর থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা দেড় লাখেরও বেশি। ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম দিচ্ছে ৫০ হাজার থেকে ৫৫ হাজার *(ইত্তেফাক, ১৫ই জুন ২০১০; পৃ. ২)*। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশু ও শিশুশ্রমের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। যেখানে শিশুরা অত্যাচার-নির্যাতন, গালিগালাজ, কথিত অলসতার দোহাই দিয়ে লোহার লাকড়ি আগুনে উত্তপ্ত করে জলন্ত লোহার নির্মম আঘাতে জর্জরিত। অসহায় শিশুশ্রমিকরা কষ্টার্জিত শ্রমের টাকা ঠিকমত পায়না। ফলে চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে তারা অসাড় কর্মহীন প্রাণীতে পরিণত হয়। বর্তমানে দিন যত যাচ্ছে তত দেশে ক্ষুধার্ত শিশু মানবতার আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাশ ভারি হয়ে উঠছে। দু'মুঠো খাওয়ার আশায় এদিক ওদিক ফ্যাল ফ্যাল নয়নে তাকিয়ে থাকে যদি কেউ একটু খাবার দেয়! অথচ তাদের দেখার কেউ নেই। ১৭ই আগস্ট ২০০৯ইং তারিখে প্রকাশিত পত্রিকা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দেশে না খেয়ে মারা যায় প্রতি মিনিটে ১৫টি শিশু *(প্রথম*

আলো, পৃ. ১০, ক. ৩)। এ প্রসঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় এই করুণ চিত্রটিই ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায়-

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায়, খায়নি কো'বাছা, কচি পেটে তার জলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান! তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না কো তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

গ. লিঙ্গবৈষম্যগত আগ্রাসন :

শিশুদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে বৈষম্যটাও অনেক সময় প্রকট হয়ে উঠে। কোথাও দেখা যায়, ছেলে সন্তান যে সুবিধা ভোগ করে, মেয়েরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ছেলেদের প্রতি পিতা-মাতার নজর বেশি থাকে। একই জায়গায় খেতে বসলে ভাল ভাল খাবার ছেলেকে দেওয়া হয়, আর শেষের খারাপ খাবার দেওয়া হয় মেয়েকে। বলা হয় যে, সে কর্মঠ, সে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে, ব্যারিস্টার হবে ইত্যাদি। আর মেয়ে! সেতো কয়দিন পরেই শশুর বাড়ি চলে যাবে। তাকে এত দেখভাল করার কোন প্রয়োজন নেই। একই পরিবারের একই মায়ের উদরে জন্ম লাভ করা সন্তান যদি এইরূপ বৈষম্যের শিকার হয়, তাহ'লে দেশের সামাজিক অবস্থা যে কত ভয়াবহ তার পরিচয় পরিস্কার উদ্ভাসিত হয়। যেন তারা বৈষম্যের প্রশিক্ষণ কোর্সের নিয়মিত শিক্ষার্থী। এতে করে ঐ ছেলে লোভী ও অহংকারে স্ফীত হয়ে নৈতিকতাহীন পশুতে পরিণত হয়। আর মেয়েরা মানসিক যন্ত্রণা ও বেদনাবেধুর কষ্টকে সহ্য করে নীরবে নির্ভৃতে চোখের পানি ফেলে। ফলশ্রুতিতে তাদের সৌরভময় সুপ্ত প্রতিভার বিকশিত হওয়ার পথ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিনষ্ট হয় তার সম্ভাবনাময় জীবনের ভবিষ্যৎ দিনগুলো।

ঘ. সমাজ পরিচালকদের উন্নাসিকতা :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের ভবিষ্যত সুনাগরিক গড়ে তোলার সর্ববৃহৎ কারিগর। ছাত্র-ছাত্রী উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। আর শিক্ষকমণ্ডলী হলেন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামক দেহের এক একটি অঙ্গ স্বরূপ। একজন শিশুকে সৎচরিত্রবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অতুলনীয়। তাই একজন শিক্ষককে হতে হবে একদিকে যেমন চরিত্রবান, পরিশ্রমী, সত্যাশ্রয়ী ও অধ্যবসায়ী। অন্যদিকে থাকতে হবে ছাত্রকে পড়ানো ও বুঝানোর যোগ্যতা। কিন্তু চলমান প্রেক্ষাপট তার সম্পূর্ণ বিপরীত। একই শ্রেণীর শিশুরা শুধু মাত্র ধনী-গরীবের পার্থক্যের বিভিন্নতার কারণে অধিকার বঞ্চিত ও অবহেলিত। অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের সামনে শিক্ষকের নিশ্চিন্ত ঘুমানো, সিগারেট খাওয়া ও আনতে বলা, অসৌজন্যমূলক আচরণ, পাঠ শেখানোর প্রতি অমনোযোগী ইত্যাদি একজন শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে যেখান থেকে বের হওয়ার কথা এক একটি সংস্কারধর্মী প্রতিভা, ইবনে তাইমিয়া, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, নাছিরুদ্দীন আলবানীর মত উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ মানব সম্পদ, যাদের প্রস্ফূটিত আলোকরশ্মির তীব্রতায় বিশ্বের বুকে বিকশিত হবে জ্ঞানের প্রদীপ, যাদের সত্যানুসন্ধানের হুংকারে বাতিল শক্তি পরাভূত হবে, কেঁপে উঠবে তাদের মায়া-মরীচিকাময় আধুনিকতার চোরাবালির দুর্বল ভীত; অথচ সেখান থেকে বের হচ্ছে আজ একজন মাস্তান, নেশাগ্রস্ত, সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদার, প্রকাশ, বিকাশের মত অপরাধ জগতের মহা খলনায়করা। এর চেয়ে করুণ বাস্তবতা আর কি হতে পারে!

করণীয় :

ক. পিতামাতার নিবিঢ় পরিচর্যা :

ইসলাম পরিবার প্রথা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পরিবারই হল মানুষের সবচেয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণকেন্দ্র। একটি শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশের জন্য পারিবারিক পরিবেশে এবং সুখ, ভালবাসা ও বোঝাপড়ার আবহে তা বেড়ে উঠা দরকার। এক্ষেত্রে সমাজের মৌলিক একক হিসাবে শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণের স্বাভাবিক পঠভূমি হিসাবে পরিবারকে সমাজের সব ধরনের নিরাপত্তা ও সহায়তা দেওয়া উচিত। যাতে সমাজ তার ভূমিকা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে *(জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ইউনিসেফ, ১১ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রত্যেক শিশু-কিশোর ফিতরাত অর্থাৎ-স্বভাবজাত ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী-খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজক বানায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ. মিশকাত হা/৯০)*। আর মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হ'ল ইসলাম। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে সে দুনিয়ায় এসে আল্লাহকে ভুলে যায় পিতা-মাতার কারণে। কারণ পিতার জীবন ও কার্যপ্রণালী একজন শিশুর উপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে পিতা যদি মাস্তান, গুণ্ডা, চোর, ডাকাত, হিরোইনখোর, নাস্তিক ইত্যাদি হয় তাহ'লে সন্তানও নিজেকে সে পথেই এগিয়ে নিয়ে যায় অতি দ্রুতগতিতে। কারণ জন্মের পর থেকেই সে এ পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। সে কোনদিন তার সন্তানকে ভাল উপদেশ দেয়নি।। একটি স্থিতিশীল ও সুশীল সমাজ গড়তে যে একটি শিশুকে চরিত্রবান ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হয় সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপই ছিলনা। অতএব, সন্তানকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়তে হলে অবিভাবকদের সচেতনতার অধিকারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

নৈতিক অগ্রগতি ও চারিত্রিক মাধুর্য্য একটি শিশুকে উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষস্থানে পৌছাতে সক্ষম। আর এটা সম্ভব কেবল ইসলামী জীবন পরিচালনার মাধ্যমে। কারণ ইসলামই একমাত্র সার্বজনীন ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম। যা প্রত্যেক যুগের জন্য উপযোগী একটি জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের হুকুম-আহকামগুলো যথাযথভাবে পালন করলে তার জীবন হবে সুশৃংখল। আর ছালাত হ'ল শৃংখল সমাজ বিনির্মাণের ও নৈতিক জাগরণের মূল হাতিয়ার। সঠিক, সুন্দর, নম্র-বিনম্র ও সুচারুপূর্ণভাবে ছালাত আদায় করলে তা হবে নৈতিক উন্নতি ও উত্তম চরিত্র গঠনে সহায়ক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এমন পিতা-মাতার সংখ্যা খুব কমই আছে যারা তাদের সন্তানদের ছালাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পড়াশুনা, খেলাধূলা ও অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নজরদারি করে থাকে। সমাজের ৯৮% শিশু-কিশোরদের ছালাত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। অবিভাবকমণ্ডলীকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র দেয়া জীবনব্যবস্থার সাথে সন্তানকে পরিচয় করে দেয়াটাই পিতা-মাতার সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য পিতা-মাতাকে অবশ্যই কিয়ামতের দিন দায়ী থাকতে হবে।

শিশুদের স্বাস্থ্য গঠন ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে পারিবারিকভাবে পিতা-মাতার ভূমিকা সর্বাগ্রে। শিশু তার সার্বিক জীবনে এককভাবে নির্ভরশীল থাকে তার পিতা-মাতার উপরে। ফলে পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানকে প্রভাবিত করে। পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য শিশুদের নৈতিক, চারিত্রিক ও মানবিক উন্নয়নে যথেষ্ট স্বতন্ত্র পথপ্রদর্শক। শিশুদের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ বহু গবেষণা করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর মন ও মনন পরিগঠনে মাতাপিতার ভূমিকাই প্রধান, অতঃপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের প্রভাব। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও মনোচিকিৎসাবিদ সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯খ্রিঃ) মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপর ব্যাপক গবেষণা করে *'থিওরি অব পারসোনালিটি'* নামে 'ব্যক্তিত্ব গঠনের তত্ত্ব' উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন, 'মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন নির্ভর করে জন্মের পর থেকে ৫ বছর (০-৫ বছর) বয়সের মধ্যে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সুসামঞ্জস্য সম্পর্কের উপর'। এই সময়টিকে তিনি ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। (ক) ০-১ বছর বয়সের সময়কে তিনি 'মৌখিক অবস্থা' (Oral stage) নাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এই সময়ে শিশুর সাথে মায়ের শারীরিক ও মানসিক সংস্পর্শে তথা সার্বিক সম্পর্ক ঠিকমতো না হ'লে পরবর্তীতে শিশু বড় হতে থাকলে তার ব্যক্তিত্বে কতগুলো অভ্যাস বা আচরণ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- আঙ্গুল চোষা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, বাঁশি বাজানো

পছন্দ করা, কলমের উল্টা অংশ মুখে দেওয়া বা চোষা, ধূমপান করা, অতিরিক্ত পান খাওয়া, অপরকে মনকষ্ট বা আঘাত দিয়ে কথা বলা, বাচালতা, পরনির্ভশীলতা ইত্যাদি। (খ) 'পায়ু অবস্থা' (Anal stage) : ১-৩ বছর বয়স কাল। এই সময় মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্কের ঘাটতি বা ব্যাঘাত হ'লে পরবর্তীতে তার আচরণে বিশৃঙ্খল, অগোছালো অবস্থা অথবা অতিরিক্ত সুশৃঙ্খল, সূচীবাই, অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা মনোভাব ও তা মেনে চলা, কার্পণ্যতা বা বেশী বেশী টাকা পয়সা খরচ করা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। (গ) 'লিঙ্গীয় অবস্থা' (Phallus stage) : ৩-৫ বছর বয়স পর্যন্ত সময়। এখানে মাতা-পিতার সাথে সুসামঞ্জস্য সম্পর্কের অবনতি হ'লে সন্তান বড় হ'লে পরবর্তীতে তার কামশীলতা অথবা কামাচারী ইত্যাদি জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে।[২] সুইস জীব বিজ্ঞানী, দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী জীন পিজেট (Jean peaget) ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তার নিজ শিশু কন্যা লুসিনের উপর গবেষণা করে লক্ষ্য করলেন যে, 'কন্যা শিশুটি ৮ মাস বয়সের পর তার মাকে খোঁজাখুঁজি করে যখন তার মা আড়ালে চলে যায়। কিন্তু ৮ মাস বয়সের পূর্বে ঐ কন্যা শিশুটি তার মাকে খুঁজত না যখন তার মা আড়ালে চলে যেত। এতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, শিশুর পরিচর্যায় মায়ের ভূমিকাই অনেক বেশী' *(মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ৮ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৫৯-৬০)*। এরিক এরিকসন (Arik Erikson) ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে 'মা ও শিশুর মিথস্ক্রিয়া' সম্পর্কে গবেষণা করে দেখলেন যে, 'মায়ের সাথে শিশুর পারস্পারিক সম্পর্কের মিথক্রিয়ার উপরই শিশুর পরবর্তী জীবনের সুষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তৈরি নির্ভরশীল'। প্রসিদ্ধ মনোরোগ গবেষকদ্বয় জন বলবে (John Bowlby) ১৯৫১-১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে এবং ই এস পিকেল (ES Paykel) ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশুদের অবস্থা'-এর উপর ব্যাপক পরীক্ষা করে দেখেন যে, 'মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকলে পরবর্তীতে ঐ শিশুরা অপরাধী বালক, মাস্তান, সন্ত্রাসবাদী, মাদকাসক্ত, মদ্যপ, বিষণ্নতা ও অন্যান্য মানসিক সমস্যা ও রোগে ভুগতে পারে'। অন্যদিকে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে মস্তিষ্কের কোষের সংযোগ স্থাপনের গুরুত্ব সর্বাধিক। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, একটি শিশুর জন্মের সময় মস্তিষ্কে ১০০ বিলিয়ন কোষ (নিউরন) থাকে। এককভাবে একটি কোষ অন্য প্রায় ১৫ হাজার কোষের সংগে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। শিশুর আট বছর বয়সের মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ কোষের ভিতর সংযোগ স্থাপিত হয়। কোষের সংযোগ থেকেই শিশুর শারীরিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সৃজনশীল ও আবেগীয় যে বিকাশ–সবকিছুই এ সময়ে সম্পন্ন হয়। আর মস্তিষ্কের বিকাশ শৈশবে না হলে আর কখনই বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। সেকারণে শিশুর শূন্য থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়সকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালকে 'প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ' বলে। এ সময় পরিবারের পক্ষ থেকে শিশুর বিকাশে যত্ন নেয়া দরকার। এ জন্য প্রতিটি শিশুর বাবা-মা এবং সন্তান লালন-পালনের সংগে জড়িত প্রত্যেকের এই 'প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ' সম্পর্কে জানা উচিত *(দৈনিক আমার দেশ ১১ই জানুয়ারী'১১, মঙ্গলবার পৃ: ৮)*।

খ. সামাজিক করণীয় :

সমাজের গতি, আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে তার জনগোষ্ঠির আদর্শ বা সংস্কৃতি। একজন শিশু শৈশবকাল থেকে সামাজিক সংস্কৃতি ও পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠে জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তার মধ্যেই সে আবর্তন করে। সামাজিক আদর্শ বা সংস্কৃতি যদি প্রগতিশীল, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন অপসংস্কৃতির লালনকারী হয় তবে শিশুর জীবন হবে অপসংস্কৃতির নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত। নীরবে নির্জনে-নিভৃতে অপমানের গ্লানিতে জীবন হবে মর্মাহত। সুতরাং একজন শিশুর জীবনের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন সমাজের এমন এক শৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবন যার ফলে সমাজের আন্তঃগোষ্ঠি অধিবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় কল্যাণকামী এক যুগপোযোগী সমাজ। সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন পারস্পারিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহনশীল সম্পর্ক। যেখানে থাকবে না গীবত-তোহমত, হিংসা-বিদ্বেষ, দাম্ভিকতা আর স্বভাবজাতহীন বৈপরীত্যপূর্ণ আচরণ। থাকবেনা ধন-ঐশ্বর্যের লোভ, নেতৃত্বের কোন্দল আর স্বার্থপরতার জঞ্জালপূর্ণ আবহ। বরং সেখানে বিরাজ করবে কল্যাণকামিতা, ভালবাসা আর স্নেহধন্য পরিবেশের ছড়াছড়ি। যেমন আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়েছিল দেড়হাযার বছরের এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে। হিজরত পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম জন্ম নেওয়া পুত্র সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে বরণ করে নেওয়ার জন্য মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে যে মধুর পরিবেশের অবতারণা হয়েছিল তা বিশ্বের ইতিহাসে শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর এটাই হবে শিশু-কিশোরদের নিরাপত্তা বিধানে সামাজিক দায়বদ্ধতা।

গ. সরকারের করণীয় :

আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়ক তাদের মধ্যে থেকেই আবির্ভাব ঘঠবে। তাদেরকে সুষ্ঠ পরিচর্যা, সুস্থ বিনোদন, বিশুদ্ধ আক্বীদাগত শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে সরকারী যে সকল পদক্ষেপ সাধারণভাবে গৃহীত হয়, তা মোটামুটিভাবে যথার্থ হলেও আমাদের দেশে যে বিষয়ে ঘাটতি দেখা যায় তা হল, উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা। শিশুদের যথাযথ ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে উঠার জন্য পরিবার ও সমাজের পাশাপাশি সরকারী বা রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপও অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে স্কুল-মাদরাসায় উন্নতমানের ধর্মীয় পাঠ্যবই প্রণয়ন, প্রতিটি শ্রেণীতে ধর্ম বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে প্রতিটি মসজিদে ইসলামী ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে শিশুদের সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিশু প্রতিপালনে ইসলামের নীতি :

শিশুদের জীবন রক্ষা, নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্য ইসলামের নীতি, আদর্শ, শিক্ষা যেমন সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট তা আর অন্য কোন আদর্শ, মতবাদ বা ধর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন-

ক. ইসলামী আক্বীদা ও সংস্কৃতির লালন :

একজন শিশুর বিকাশ মূলত হয় দুইভাবে–শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক বিকাশ বলতে শিশুর দৈহিক অবয়বের পরিবর্তন এবং আকার-আকৃতির উত্থান-পতনকে বুঝায়। মানসিক বিকাশ বলতে শিশুর চিন্তা-চেতনা, বোধ শক্তি, অনুভূতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও ভাবের আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে শিশুর ক্ষমতা অর্জনকে বুঝায় *(আবুল হায়াত মুহাম্মাদ তারেক, ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার (পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৭ ইং, পৃঃ ১৮)*। উক্ত বিকাশ ছাড়া শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দকে প্রাথমিক পর্যায়ে বৈবাহিক জীবনের গুরুত্ব ও মাতৃগর্ভে শিশুর আগমন ও বেড়ে উঠা, গর্ভকালীন শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালন, গর্ভবতী মায়ের সুষ্ঠু চিকিৎসা ও ধৈর্যের নসিহত, গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জন্ম-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, জন্ম-পরবর্তী শিশুর সার্বিক প্রতিপালন, পিতৃ ও মাতৃস্নেহে শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালন এবং সর্বোপরি পিতা-মাতার মনন, চিন্তা-চেতনা বা সংস্কৃতি ইসলামী বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্বলিত জ্ঞান সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা থাকতে হতে হবে। সর্বপ্রকার বাতিল আক্বীদা, চিন্তাধারা ও নোংরা সংস্কৃতির নাগপাশ থেকে সর্বোতভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে। উপরিউক্ত বিষয়গুলো শতভাগ বাস্তবায়িত হলে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনলশীলতা প্রকাশে কোনরূপ বাধা থাকবে না। এগুলোর পিছনে ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা এগুলো শিশুর মনস্তাত্তিক বিকাশে অন্যতম সহায়ক শক্তি।

২. মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ৮ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৫৯-৬০; মোঃ লুৎফর রহমান ও এ. কে.এম শওকত আলী খান, সমাজ মনোবিজ্ঞান (গ্রন্থ কুটির, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ অক্টোবর ২০০৯), পৃ. ১৯২-২১৯।

খ. উপযুক্ত শিক্ষাদান :

শিশুর সার্বিক বিকাশে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিশুর শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা দুই প্রকার। ক. জাগতিক শিক্ষা খ. ধর্মীয় শিক্ষা। ইসলাম শিশুকে এই উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে অভিভাবকদের কঠোরভাবে নির্দেশনা প্রদান করে। কারণ মানুষের শৈশবকালীন শিক্ষার উপরেই তার বিস্তীর্ণ জীবনের ভিত রচিত হয়। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর শিক্ষা অর্জন করা ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*। অন্যত্রে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তির নিকটে কোন দাসী থাকে আর সে যদি তাকে উত্তম শিক্ষা দেয় এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় অতঃপর তাকে মুক্তি করে বিবাহ করে তাহ'লে তার জন্য দুই নেকী' *(বুখারী হা/৫০৮৩ ; মুসলিম হা/৪০৪)*। অন্যদিকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ ধারণা থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ) একজন দাসীকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি প্রদানের কথা বলেছিলেন। যেমন-মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমার একজন দাসী ছিল। সে আমার ছাগল চরাতো। একদিন হঠাৎ করে বনের বাঘ ছাগল পাল থেকে একটি ছাগলের বাচ্চা নিয়ে গেল। ফলে আমি রাগান্বিত হয়ে তার গালে একটি থাপ্পড় মারি। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি বড় অন্যায় করে ফেলেছি (তখন তাকে ঘঠনাটি বললাম)। অতঃপর বললাম, আমি কি তাকে মুক্ত করে দিব ? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। তাকে নিয়ে আসা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. 'বলতঃ আল্লাহ কোথায়? বালিকাটি বলল, আল্লাহ আসমানে। অতঃপর তিনি বললেন, বলতঃ আমি কে? বালিকাটি বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি বললেন, তাকে (বালিকাকে) মুক্ত করে দাও। কেননা সে মুমিনা মহিলা' *(মুসলিম হা/১২২৭; মিশকাত হা/৩৩০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬১)*। সুতরাং শৈশব কালের বিশুদ্ধ ও সঠিক শিক্ষা কত গুরুত্বপূর্ণ উপরোক্ত ঘটনা তার বাস্তব প্রমাণ।

সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার অন্যমত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে লোকমান হাকীম তার সন্তানকে যে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন সেটি প্রনিধানযোগ্য *(সূরা লোকমান দ্রষ্টব্য)*। তিনি তাঁর সন্তাকে মূলত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কিত মৌলিক তিনটি বিষয়ে জ্ঞান দান করেছিলেন। সুতরাং সন্তানকে নির্ভেজাল তাওহীদের স্বরূপ ও প্রকৃতি, রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করতে হবে। তাহ'লে ঐ সন্তান হবে একজন সমাজ সংস্কারক, সমাজে ঘুনেধরা সকল ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিজাতীয় মতবাদকে পদপিষ্ট করে আল্লাহ্র উপর আস্থা রেখে সম্মুখ পানে অগ্রসর হবে। ফলে বিজয় লাভ করবে তাকওয়া, বিতাড়িত হবে যাবতীয় অন্যায়, দুর্নীতি আর অসত্যের দুর্বল ভিত, চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে অহংকারীর দাম্ভিকতা। শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে সমাজের আনাচে কানাচে। সুতরাং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতই হবে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর বিকাশে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা।

গ. উসওয়াহ হাসানাহ বা উত্তম নমুনা :

মানুষের বাস্তব জীবনের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডল অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, অবহেলা-অবজ্ঞা আর ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঘূর্ণায়মান। হক্ব গ্রহণ ও প্রতিপালন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সম্মুখিন হতে হয়। নবী-রাসূলদের নবুয়তী জীবন, ছাহাবায়ে কেরামগণের সংগ্রামী জীবন, সালাফে-ছালেহীনদের বিপ্লবী জীবন আর যুগে যুগে হক্বপন্থী মুসলিম মনীষীগণের জীবনীতিহাস তার জাজ্বল্য প্রমাণ। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের জীবনী শিশুদের মাঝে সংগ্রাম মুখর বাস্তব জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। তাদের মত আজকের শিশুরা যেন ধৈর্যের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বাস্তব জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্বীদা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের যুগে আবু বকর, ওমর, বেলাল, হামযা, মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ), ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারী, নাছিরুদ্দীন আলবানী, মূসা বিন নুসায়ের, তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (রহঃ) প্রভৃতির মত দৃঢ় হিমাদ্রিসম অবস্থান গ্রহণ করে দ্বীন ইসলামকে যেন আবার বিশ্বের বুকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান পরিস্কার। এটাই শিশুর বাস্তব জীবনে অবদানের জন্য ইসলামের নীতি।

কতিপয় প্রস্তাবনা :

শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা ও নৈতিক বিকাশে সরকারের নিকট আমাদের পক্ষ থেকে কতিপয় প্রস্তাবনা উল্লেখ করা হলো :

১. শিশুর জন্ম-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থাকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিবিড়ভাবে পরিচর্যার জন্য সরকারীভাবে স্থানীয় পর্যায়ে 'নিরাপদ মাতৃত্ব সেবাদান কেন্দ্র' স্থাপন করা।

২. শিশুদের সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ছেলে-মেয়েদের পৃথক শিফটিং শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করা এবং মাযহাব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সিলেবাস পূর্ণাঙ্গভাবে বাতিল করা। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আক্বীদা, আমল, আখলাক্ব, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও পদ্ধতি সমূহ এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের নিষ্কলুষতা শিক্ষা দান 'প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী'তে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য প্রদান করা।

৩. শিশুদের সুপ্ত ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও নৈতিক অবক্ষয়রোধে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে 'শিশু সাংস্কৃতিক অঙ্গন' নামে একটি সুস্থ বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা। যেখানে দেশীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আকাশ সংস্কৃতির ভয়ানক থাবার কোন সংস্পর্শ থাকবে না।

৪. অভিভাবকদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদানের জন্য প্রতিটি এলাকায় একটি 'অভিভাবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' কিংবা প্রতিদিন 'পারিবারিক বৈঠক'-এর ব্যবস্থা গ্রহণের সার্বিক ব্যবস্থার গ্রহণের পৃষ্ঠাপোষকতা প্রদান করা। যেখানে ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়সহ বিশেষ করে বিশুদ্ধ আক্বীদা বিষয়ক প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা।

৫. শিশু শ্রম, শিশু অপব্যবহার, শিশু নির্যাতন ও শিশু পাচারসহ প্রভৃতি শিশু বৈষম্যকে কার্যকর ও স্থায়ীভাবে বন্ধ করা এবং অপরাধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

৬. সর্বোপরি শিশু জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে স্মরণ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ গ্রহন করে তার জীবন পরিচালনা করতে পারে তার সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ার জাযবা তৈরী করা।

উপসংহার :

আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধর। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাদের জীবনের রক্ষা, সুষ্ঠ নিরাপত্তা, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার পথ উন্মোচন করা এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র একমত যে, যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব ও প্রকৃত সৎ নাগরিক ব্যতীত রাষ্ট্র তার স্বমহিমায় দণ্ডায়মান হতে পারে না। তাই তারা বিভিন্ন নীতিমালা, শিশু অধিকার সনদ ও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও অব্যহত রেখেছে। এক্ষেত্রে আমরা জাতির সম্মুখে কতিপয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছি। সুতরাং আমাদের সন্তানকে সৎ ও যোগ্য নাগরিক এবং তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যাবতীয় অন্যায়-অসত্য, যুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতির কালো হাত অপসারিত হয়ে শান্তির রাজ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে বিখ্যাত দার্শনিক নেপোলিয়ানের দার্শনিক বক্তব্য পেশ করেই শেষ করছি। তিনি বলেন, Give me a educated mother, I will give you a educated notion 'অর্থাৎ আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দিব'।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

ফিরোজ মাহবুব কামাল

কেন এত মিথ্যাচার?

আল্লাহর আর কোন হুকুম বা বিধানের বিরুদ্ধে এত মিথ্যাচার,এত কুৎসা ও এত হামলা হয়নি, যতটা হয়েছে জিহাদের বিরুদ্ধে। আস্তিক-নাস্তিক, সেক্যুলারিস্ট-সোসালিস্ট, জাতীয়তাবাদী-স্বৈরাচারী-ইসলামের সকল বিপক্ষ শক্তি এ হামলায় একতাবদ্ধ। সে মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই বৃটিশ সরকার কোলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা খুলেছিল। ধর্মশিক্ষার নামে তখন ষড়যন্ত্র হয়েছিল ইসলামের মূল শিক্ষা লুকানোর। ফলে সে মাদরাসা থেকে হাজার হাজার আলেম বের হলেও তাদের দ্বারা ইসলামের প্রকৃত খেদমত পাওয়া যায়নি। বরং বিভ্রান্তি বেড়েছে জিহাদ নিয়ে। নবী (ছাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ যেভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় এনেছিলেন তা থেকে এ সকল আলেম অনেক দূরে। জিহাদের বিরুদ্ধে আজ লেখা হচ্ছে বই, দেশী-বিদেশী অর্থে গড়ে তোলা হয়েছে অসংখ্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

ধর্মের তাবলীগ বা প্রচার হলেই তা প্রতিষ্ঠা পায় না। বিশ্বজোড়া বিজয়ও আসে না। সে জন্য লাগাতার সংগ্রাম চাই। অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার সে লড়াই বা প্রচেষ্টাকেই বলা হয় জিহাদ। হতে পারে সে জিহাদ কথার মাধ্যমে, কলমের মাধ্যমে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিংবা চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। মুসলমানের প্রতিটি কর্ম যেমন ইবাদত, তেমনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি সংগ্রামই জিহাদ। আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে এটিই মূল হাতিয়ার। জিহাদের মধ্য দিয়েই মুসলিম সমাজে পরাজয় ঘটে শয়তানী শক্তির এবং সে সাথে বিলুপ্ত হয় মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সকল শয়তানী প্রজেক্ট। জিহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও মিথ্যাচারের মূল হেতু এখানেই। কারণ এসব পথভ্রষ্টরা নিজ জীবনে অহি-র বিধানকে মানতে রাজী নয়, রাজী নয় রাষ্ট্রে বা সমাজে তার প্রতিষ্ঠাতেও। ফলে তাদের শত্রুতা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, গভীর শত্রুতা ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল হাতিয়ারটির বিরুদ্ধেও। সে লক্ষ্যেই তারা জিহাদকে মুসলমানদের থেকে কেড়ে নিতে চায় এবং বিলুপ্ত করতে চায় জিহাদের ধারণাকে। সে লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল পাশ্চাত্য দেশের সরকার মুসলিম দেশে মসজিদের খুৎবা, পত্র-পত্রিকা ও স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর উপর লাগাতার নজরদারী রাখছে– যাতে মুসলমানদের মাঝে জিহাদী চেতনা গড়ে না উঠে। প্রতিটি দেশে তাদের সাথে জোট বেধেছে মুসলিম নামধারী দল ও গোষ্ঠীও।

এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশে জিহাদের বিরুদ্ধে জোরে শোরে কথা বলতো কাদিয়ানী ভ্রষ্টতার জনক বৃটিশ মদদপুষ্ট গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। অনেকেরই ধারণা, কাদিয়ানী ফেরকার জন্মই হয়েছিল জিহাদকে অধর্ম ঘোষণা দিতে। কারণ জিহাদী চেতনার কারণে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসন কখনই উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে মনেপ্রাণে গ্রহীত হয়নি। বরং সে শাসনের বিরুদ্ধেই ছিল তাদের অবস্থান। তবে এখন শুধু কাদিয়ানীরাই জিহাদের বিরুদ্ধে নয়, বহু আলেম এবং মুসলিম নামধারী বহু নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরাও ময়দানে নেমেছে। তাদের সে মিথ্যা প্রচারণা যে বিপুল সফলতাও এনেছে, তা বলাই বাহুল্য। তাদের লাগাতার প্রচারণার ফলেই কোনমতে ছালাত-ছিয়াম, হজ-যাকাত বেঁচে থাকলেও জিহাদ বেঁচে নেই। আর জিহাদ না বাঁচলে কি বিশুদ্ধ ইসলাম বাঁচে? বাড়ে কি ইসলামের গৌরব? আজ মুসলিম দেশগুলোতে যে ইসলাম বেঁচে আছে সেটি কি রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই ইসলাম? রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমলের সন্ধান আজ মুসলিম সমাজে নেই, নেই সেই বিশ্ব মানবাধিকারের চিরন্তন সনদ শরঈ আইন-কানূন। নেই সে ইসলাম, যে ইসলামে লাগাতার জিহাদ ছিল এবং হাযার হাযার সাহাবীর জানমালের কোরবানীও ছিল। সে কোরবানীর বরকতে মুসলমানদের সেদিন বিশ্বজোড়া ইয্যত ছিল। সমাজে ছিল সুবিচার এবং শান্তি। তখন রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ। মুসলিম রাষ্ট্রের আদালতে আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার হবে না–সেটি সেদিন অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু আজ সে ইসলাম নেই। সে ইসলামী সমাজ ও শরঈ বিধি-বিধানও নেই। ইসলামী রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়ার পর লুপ্ত হয়েছে মুসলমানদের ইয্যত, জেঁকে বসেছে পরাজয় ও অপমান। ইসলামী রাষ্ট্রের স্থান দখলে নিয়েছে জাতীয় রাষ্ট্র বা নেশন স্টেট। শাসকের যে আসনে রাসূল (ছাঃ) বসতেন, সে আসনে আজ বসেছে অতি দুর্বৃত্ত অপরাধীরা। তাদের অঙ্গীকার আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রতি নয়, বরং শয়তানকে খুশী করা। জিহাদের স্থলে স্থান পেয়েছে ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, গোত্রীয় বা জাতীয় স্বার্থের লড়াই। জিহাদ বিলুপ্ত হলে ইসলামী রাষ্ট্র ও তাঁর শরিয়তী বিধানের বেঁচে থাকাও যে অসম্ভব, আজকের মুসলিম ইতিহাসে সেটিই এক প্রতিষ্ঠিত সত্য।

জিহাদ ছাড়া কি ইসলাম-পালন সম্ভব?

কোন ধর্ম এবং সে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র শূন্যে প্রতিষ্ঠা পায়না। সেখানে পূর্ব থেকেই একটি ধর্ম বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটে সে ধর্ম বা মতবাদের অনুসারীদের পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে। কোন একটি গাছ লাগাতে হলেও কিছু মাটি এবং তার আশেপাশের আগাছা ছাফ করে স্থান করে দিতে হয়। তবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা আর গাছ লাগানো এক জিনিষ নয়। আগাছা প্রতিবাদ করে না, কিন্তু মানুষ লড়াই শুরু করে। তাই যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে সরানোর কাজ শুরু হলেই সাথে সাথে জিহাদও শুরু হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় একমাত্র বিপক্ষ শক্তির পরাজয় ঘটার মধ্য দিয়েই। রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় নরম হৃদয়ের মানুষের পক্ষেও সেটি এড়ানো সম্ভব হয়নি। কোন যুগেও সেটি সম্ভব নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে সংঘাত অনিবার্য। সে সংঘাত শুধু অর্থ, শ্রম ও মেধা চায় না, রক্তও চায়। আরো কোন ইবাদতই এত বড় কোরবানী চায় না। জিহাদ এজন্যই শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সারা জীবন ছালাত-ছিয়াম পালনের মধ্যদিয়েও কোন মু'মিন বিনা বিচারে জান্নাত পায় না, কিন্তু সেটি জিহাদে প্রাণদানকারী শহীদ পায়। মৃত্যুর পরও সে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক পায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে প্রতিশ্রুতি বহুবার এসেছে। অথচ ইসলামের বিপক্ষ শক্তি ইসলামের এ শ্রেষ্ঠ ইবাদতটি চিহ্নিত করছে সন্ত্রাস বা জঙ্গী মতবাদ রূপে। তাদের সে লাগাতার মিথ্যাচারের কারণেই বর্তমান মুসলিম সমাজ চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে জিহাদের সঠিক ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে। অথচ জিহাদের দর্শন বুঝতে ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে কোরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করা। তখন অসম্ভব হয় এ বিশ্বজগত এবং মানবসৃষ্টি নিয়ে মহান আল্লাহর মূল ভিশনটি উপলব্ধি করা। অসম্ভব হয় নবীজীবনের মূল শিক্ষা থেকে সবক নেয়া। বস্তুত ইসলামের মূল শিক্ষাই তার কাছে অজানা থেকে যায়। তখন পদে পদে যেটি প্রকটরূপে দেখা দেয় সেটি হ'ল পথভ্রষ্টতা। আজকের মুসলিম সমাজে

তো মূলত সেটিই ঘটছে। ফলে জিহাদ ছেড়ে 'যিকরে খফী', 'যিকরে জলী' আর নানা অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে তারা প্রবল সুখে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। শিরক-বিদ'আতী নানা রসম রেওয়াজের স্রোতে প্রকৃত মুসলিম খুঁজে পাওয়াই যে এখন চরম দায়। এ সবই জিহাদী জাযবা বর্জিত হওয়া এবং জিহাদের মূল দর্শন না বোঝার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

প্রশ্ন হ'ল– মানবসৃষ্টি, রাসূল প্রেরণ এবং কোরআন নাযিলের মাঝে মহান আল্লাহর মূল অভিপ্রায়টি কি? মহান আল্লাহ তা'আলার লক্ষ্য কি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর দখলদারী তার অবাধ্যদের হাতে ছেড়ে দেয়া এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে পরাজয় মেনে নেয়া? পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে কি শুধু কিতাবে ও মসজিদের চার দেয়ালের মাঝে সীমিত রাখা? এটি তো তাঁর দ্বীনের জন্য পরাজয়ের পথ! মহান আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায়টি কি সেটি তিনি অস্পষ্ট রাখেননি। পবিত্র কুরআনের নানা স্থানে সেটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা হাদীদে তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। এটি এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে (আল্লাহকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর ও পরাক্রমশালী *(হাদীদ ২৫)*। উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ পাকের যে উদ্দেশ্যটি প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা হল, সমাজে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা। সে ন্যায়নীতির উৎস কোন রাজনৈতিক নেতা বা দার্শনিকের বাণী নয়, কোন বিচারকের খেয়ালখুশি ভিত্তিক রায়ও নয় এবং কোন সংসদের তৈরী আইনও নয়। বরং সেটি তাঁর নাযিলকৃত মহাজ্ঞানময় কোরআন। তবে সে কুরআনী ন্যায়নীতি ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা শুধু রাসূল প্রেরণ ও কোরআন প্রেরণের কারণে ঘটে না। সেজন্য অপরিহার্য হলো শক্তির প্রয়োগও। সে বাস্তবতার নিরিখে তিনি শুধু কিতাবই নাযিল করেননি, লৌহও প্রেরণ করেছেন। লৌহ থেকে নির্মিত হতে পারে ঢাল-তলোয়ার, বর্শা এবং কামান যা ব্যবহৃত হতে পারে শত্রুদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে। ইসলাম ও অনৈসলামের সে দ্বন্দ্বে মহান আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য নীরব বা সরব দর্শক হওয়ার কোন সুযোগ রাখেননি। স্রেফ ছালাত-ছিয়াম ও হজ-যাকাতের আড়ালে ধার্মিক সাজার পথও খোলা রাখেননি। বরং তিনি সর্বদা এ নজরও রাখছেন কারা ইসলামের বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবেলায় তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তাই তাঁর দ্বীনের প্রকৃত ঈমানদারের জন্য জিহাদ থেকে পিছু হটার কোন রাস্তা নেই। জান্নাতে যেতে হলে একমাত্র এ রাস্তা দিয়েই তাকে এগুতে হবে। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর মহান সাহাবীগণ একমাত্র এ পথ দিয়েই এগিয়েছিলেন। তাদের সামনেও এছাড়া অন্য কোন রাস্তাই খোলা ছিল না। প্রশ্ন হলো, ইসলামের এ প্রাথমিক জ্ঞানটুকু ছাড়া রাসূল (ছাঃ) বার বার জিহাদে যাওয়া এবং সে জিহাদে নিজে আহত হওয়া, শতকরা ৬০ ভাগের বেশী সাহাবীর শহীদ হওয়ার মত মুসলিম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা নেয়া কি আদৌ সম্ভব? সম্ভব কি কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বুঝা? মুসলমানগণ যে সে শিক্ষালাভে আজ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা কি তাদের আজকের পরাজিত অবস্থাই প্রমাণ করে না? তবে প্রকৃত অবস্থা আরো গুরুতর! আঁধারের চামচিকা যেমন আলোকে ঘৃণা করে, তেমনি মুসলিম নামধারী পথভ্রষ্টরা ঘৃণা করে অহি-র আলোময় জ্ঞানকে। চরম ঘৃণা করে সে অহি-র বিধানের অনুসারীদেরকেও। ফলে অহি-র সে আলোকে রুখতে তারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কাফের শক্তির সাথে কোয়ালিশন গড়েছে। যুদ্ধ শুরু করেছে কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে।



সেকালের এবং একালের ইসলাম :

ইসলামের দুটি রূপ। একটি একালের এবং অপরটি সেকালের–তথা শুরুর সময়ের। একটি উপর্যুপরি বিজয় ও গৌরবের, অপরটি লাগাতার পরাজয় ও অপমানের। আজকের মুসলমানদের মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয়ে প্রচণ্ড বিতণ্ডা থাকলেও অন্ততঃ একটি বিষয়ে বিতর্ক নেই। তা হলো নিজেদের আজকের পরাজিত, অপমানিত ও শক্তিহীন অবস্থা নিয়ে। সংখ্যায় প্রায় ১৫০ কোটি হলে কি হবে, বিশ্ব-রাজনীতিতে তাদের মতামতের কোন গুরুত্বই নেই। আমলে নেয়া দূরে থাকে, তাদের মতামত কেউ জানতেও চায় না। যে ক্ষমতা ও ইজ্জত নিয়ে ছয় কোটি বৃটিশ বা সাড়ে ছয় কোটি ফরাসী জাতিসংঘে বা বিশ্বের কোন মঞ্চে কথা বলে, সে ক্ষমতা ও ইজ্জত ১৫০ কোটি মুসলমানের নেই। মুসলিম দেশের সংখ্যা ৫৫টিরও বেশী, কিন্তু এর মধ্যে অধিকাংশ দেশই শত্রু শক্তি দ্বারা অধিকৃত। সেটি যেমন সামরিকভাবে, তেমনি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে। ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়ার ন্যায় বহু মুসলিম ভূমি পরিণত হয়েছে বদ্ধভূমিতে। সভ্যতার বিনির্মাণে যখন মুসলমানদের যাত্রা শুরু হয়, তখন সংখ্যায় তারা বিশাল ছিল না। তাদের হাতে এত সম্পদও ছিল না। কিন্তু তখন উপর্যুপরি বিজয় এসেছিল। আর আজ সংখ্যা বেড়েছে, সম্পদও বেড়েছে। কিন্তু তাতে বিজয় না বেড়ে মুসলিম ভূমি অধিকৃত হচ্ছে। তখন কুরআনের শরঈ আইন প্রতিটি মুসলিম জনপদে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল সবচেয়ে সভ্য ও মানবিক আইন রূপে। সে শারঈ আইন এশিয়া ও আফ্রিকার বাইরেও মুসলিম শাসিত ইউরোপের স্পেন, গ্রীস, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া, সাইপ্রাস, ক্রিমিয়ার ন্যায় বহু দেশে বহু শত বছর যাবত চালু ছিল। আর আজ সে শরঈ আইন মুসলমানদের নিজ দেশেই আস্তাকুঁড়ে গিয়ে পড়েছে।

এ পরাজয়টি নিছক মুসলমানদের নয়, বরং মহান আল্লাহর দ্বীনের। এখানে পালিত হয়নি মুসলমানদের মূল দায়ভার। আল্লাহ্‌র সাথে মুসলমানদের এটিই সবচেয়ে বড় গাদ্দারী তথা বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর দ্বীনের পরাজয় নিশ্চিত করা ছাড়া আর কোন কল্যাণই তারা করেনি। তারা রাষ্ট্র গড়েছে, রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনী গড়েছে এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিশাল বিশাল অস্ত্রভাণ্ডারও গড়েছে। কিন্তু সেগুলি আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নয়, সেগুলির লক্ষ্য বরং নিজ দেশ, নিজ দল বা নিজ গোত্রকে বিজয়ী করা। এসব দেশের ভিত্তি ইসলাম বা ইসলামী ভাতৃত্বও নয়। বরং রাষ্ট্র গড়েছে পৃথক পৃথক ভাষা, ভূগোল ও গোত্রের নামে এবং এগুলোর নামে তারা আন্দোলন করে, যুদ্ধ করে এবং রক্তও দেয়। বিগত বহু শতাব্দী জুড়ে বহু লক্ষ

মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে মূলত এসব ন্যাশন বা ট্রাইবাল স্টেটের নামে। অথচ মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়বদ্ধতা কাঁধে নেয়া। এ কাজে সে অর্থ দিবে, শ্রম দিবে, মেধা দিবে এবং প্রয়োজনে প্রাণও দিবে–এটাই হলো মুসলমান হওয়ার সে মূল দায়বদ্ধতা। তাদের সে কোরবানীর প্রতিদানরূপে মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন। মহান আল্লাহ্র সাথে ঈমানদারের এটিই পবিত্র চুক্তি। পবিত্র কুরআনে সে চুক্তির কথাটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে এভাবে– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা (আল্লাহর সাথে কৃত এ চুক্তি অনুসারে) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর দ্বীনের শত্রুকে) নিধন করে এবং নিজে নিহত হয় *(তাওবা ১১১)*। প্রশ্ন হলো–যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান আছে সে কি মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পাদিত এ চুক্তির সাথে গাদ্দারী করতে পারে? সেটি করলে সে কি মুসলমান থাকে? মুসলমান হওয়ার অর্থই তো হলো আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের প্রতি অনুগত হওয়া। অপরদিকে কুফরী হলো সে হুকুমের বিরুদ্ধে যে কোন অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ।

সেকালে মুসলমানদের কাছে যে পবিত্র কুরআন ছিল, আজও তাদের কাছে একই কুরআন রয়েছে অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায়। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর মহান ছাহাবীগণ যেভাবে ইসলাম পালন করতেন এবং কাফের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যেভাবে তাঁরা ইসলামের বিজয় এনেছেন সে ইতিহাসও আজ অজানা নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতসমূহ অতিশয় খুঁটিনাটিসহ বিদ্যমান রয়েছে পবিত্র হাদীছ গ্রন্থগুলিতে। ছাহাবীদের ইসলাম পালন ও জান-মালের কোরবানীর বিবরণ রয়েছে তাদের জীবনচরিতে। সেই একই কুরআন ও একই নবীর (ছাঃ)-এর অনুসারী বলে দাবী করে আজকের মুসলমানগণ। দাবী করে ছাহাবায়ে কেরামের অনুসারীরূপেও। কিন্তু তাদের অর্জিত বিজয় ও গৌরব আজ জুটছে না, বরং জুটছে পরাজয় ও অপমান? কিন্তু এ নিয়ে ভাবনা আজকের মুসলমানদের ক'জনের? একই পথে শত শত বছর চলার পরও যখন সফলতা জুটছে না তখন কি চলার পথটি নিয়ে সন্দেহ জাগে না? ধর্মপালনের নির্ভুলতা নিয়েও কি প্রশ্ন জাগে না? আজকের ধর্মপালন এবং সেকালের ধর্মপালন একই রূপ হলে ফলাফলটিও কি একই রূপ হওয়া উচিত ছিল না? ধর্মপালনে ভুল হলে আখেরাতেও কি তা উপকারে আসবে? সেটিও কি গুরুতর ভাবনার বিষয় নয়? কিন্তু আজকের মুসলমানদের জীবনে সে ভাবনা কই? আজকের মুসলমানদের জীবনে কালেমা পাঠ ও তসবীহ-তাহলীলও আছে। ছালাত-ছিয়াম এবং হজ-যাকাতও আছে। প্যারিস বা লন্ডনের মত কাফের অধ্যুষিত শহরে আজ যত ছালাত ও ছিয়াম আদায়কারী আছে, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সময় ততজন ছালাত ও ছিয়াম পালনকারী সমগ্র মুসলিম ভূমিতে ছিল না। কিন্তু তাতে কি কোন গৌরব বাড়ছে? মুসলমানের অর্থ শুধু কালেমা পাঠ বা ছালাত-ছিয়াম, হজ-যাকাত আদায় নয়। ইসলাম মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া একটি পরিপূর্ণ প্যাকেজ। ইসলামকে গ্রহণ করতে হলে তার পুরা প্যাকেজটি গ্রহণ করতে হবে। প্রেসক্রিপশনের সবগুলো ঔষধ সেবন না করলে অসুখ সারে? তেমনি আল্লাহ্র দেয়া প্রেসক্রিপশনের ব্যাপারেও। মুসলমানের অর্থ পরিপূর্ণ মুসলমান। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা চলে না, বিশ্বাসের অর্থ পরিপূর্ণ বিশ্বাস। ইসলামের হুকুমগুলি তাই ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জনের নয়। কুরআনে বলা হয়েছে 'উদখুলূ ফিস সিলমে কা-ফফা' অর্থাৎ 'প্রবেশ করো ইসলামে পুরাপুরিভাবে'। তাই ইসলাম কবুলের অর্থ শুধু স্রেফ ছালাত-ছিয়াম, হজ-যাকাত আদায় নয়। ইসলাম শুধু ছালাত-ছিয়াম, হজ-যাকাত নিয়ে আসেনি, এসেছে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিধিবিধান নিয়েও। সে বিধানে শান্তির কথা যেমন আছে, তেমনি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের কথাও আছে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ইসলাম পালনে এসব কিছুই ছিল। কিন্তু আজকের মুসলমানদের ক্ষেত্রে এখানেই ঘটেছে বিশাল বিচ্যুতি ও বিভ্রাট। সীমাহীন ব্যর্থতা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে জানমালের কুরবানী পেশে। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণের ধর্মপালনে ছালাত-ছিয়াম, হজ-যাকাতের সাথে লাগাতার জিহাদও ছিল। সে জিহাদই ঈমানদারদের লাগাতার বিজয় এনেছিল। মদীনার সামান্য একটি পল্লী থেকে যতজন ঈমানদার আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দিয়েছেন, প্রাণের সে কুরবানী ১৬ কোটি মুসলমানের বাংলাদেশ দেয়নি। ফলে সেদিন কাফের অধ্যুষিত আরবে ইসলামের সামগ্রিক বিজয় আসলেও মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে সে বিজয় আসেনি। দেশটিতে আল্লাহ্র আইন তথা শরী'আতের বিজয়ও আসেনি। কারণ জিহাদের লক্ষ্য শুধু মুসলিম ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা দেয়া নয়, পৃথিবী জুড়ে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় সাধনও। ইসলাম শুধু তাবলীগ বা প্রচারের জন্য আসেনি, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্যও এসেছে। যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে– ليظهره علي الدين كله অর্থাৎ সকল ধর্ম বা দ্বীনের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী রূপে দেখা এবং সে বিজয়টি অর্জিত হতে হবে মানুষের দ্বারা, ফেরেশতাদের দ্বারা নয়। ঈমানদারের দায়িত্ব হল, মহান আল্লাহ্র সে ভিশনের সাথে একাত্ম হওয়া, আল্লাহ তা'আলার সে লক্ষ্যপূরণকে নিজ জীবনের মিশন বানিয়ে নেয়া।

পরীক্ষা এবং মর্যাদা রয়েছে জিহাদেই :

মু'মিনের জীবনে সর্বোচ্চ পরীক্ষাটি হয় জিহাদে। জান ও মালের এমন পরীক্ষা আর কোনভাবেই হয়না। কালেমা পাঠে শ্রম ব্যয়, অর্থব্যয় ও প্রাণের ক্ষতি হয় না। ফলে ঈমানের দাবীতে কে সাচ্চা আর কে ভণ্ড–সে পরীক্ষা কালেমা পাঠে হয় না। তেমনি অর্থ ও প্রাণের ক্ষতি ছালাত-ছিয়াম পালনেও হয় না। কিন্তু আরাম-আয়েশের সাথে প্রাণে বাঁচাটি বিপদে পড়ে জিহাদে নামলে। সাথে তো রয়েছে অর্থ-সম্পদের ক্ষতিও। তাই মহান আল্লাহ্র কাছে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। এ জগতে কোন প্রমোশন বা পদোন্নতিই পরীক্ষা ছাড়া হয়নি। প্রমোশন বা মর্যাদা তো বাড়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর। যার জীবনে পরীক্ষা নেই, তার জীবনে প্রমোশন বা মর্যাদাও নেই। আর জিহাদ তো ঈমানদারের জীবনে সে পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয়। সে পরীক্ষার কথাটি পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবে– 'মানুষ কি মনে করে যে তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নিবেন মিথ্যুকদেরকে *(আনকাবূত ২-৩)*। ফলে যখন কোন দেশে মানুষের মাঝে বিজয় ও ইজ্জত লাভের আগ্রহ বাড়ে তখন সে জিহাদের পরীক্ষাও ঘন ঘন আসে। রাসূল (ছাঃ)-এর তো সেটিই হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে যে কোন দেশে যে কোন বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন। সে বিজয় ঠেকাতে কেউ কি মহাশক্তিমান আল্লাহ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? তাঁর নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যে যেমন প্রলয়ংকরী সুনামি আসতে পারে, তেমনি তাঁর দ্বীনের বিজয়ও আসতে পারে। কিন্তু সেটি হলে ঈমানদারদের পরীক্ষা হয় না, তাদের প্রমোশন লাভের সুযোগও জুটে না। ফলে সেটি মহান আল্লাহর হিকমতও নয়। বরং যুগে যুগে যে হিকমতটির প্রয়োগ ঘটেছে তা হল, জিহাদের মধ্য দিয়ে মু'মিনদের পরীক্ষা করা এবং সে পরীক্ষায় কৃতকার্যদের পুরস্কৃত করা। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের সে হিকমাত বা পরিকল্পনার কথাটি ঘোষণা করেছেন এভাবে–'তোমরা (শত্রুর বিরুদ্ধে) জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটিই বিধান। আল্লাহ ইচ্ছা করলে

তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান, তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না *(মুহাম্মদ ৪)*।

মুনাফিকদের থেকে ঈমানদারদের পৃথক করতে জিহাদ ছাঁকুনির কাজ করে। আগুনের তাপে আবর্জনা যেমন খাদ রূপে পানির উপরে ভেসে উঠে, জিহাদও তেমনি ভাসিয়ে তোলে মুনাফিকদের। রাব্বুল আলামীন থেকে মুনাফেকী লুকানোর রাস্তা নেই। ব্যক্তির মনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। তাই ব্যক্তির ঈমানের অবস্থা জানার জন্য তার ইবাদত দেখার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু মহান আল্লাহ চান, মৃত্যুর আগেই ব্যক্তি তার নিজের ঈমানের আসল অবস্থাটি জেনে যাক। ঈমানের প্রকৃত অবস্থাটি প্রকটভাবে তুলে ধরে মূলতঃ জিহাদ, সেটি জিহাদে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির নিজের সামনে যেমন, তেমনি অন্যদের সামনেও। মুসলমানেরাও একমাত্র জিহাদের ময়দানেই সঠিকভাবে জানতে পারে কে তাদের নিজেদের লোক, আর কে নয়। জানমালের কোরবানীর সে পরীক্ষাটি মসজিদের জায়নামাযে হয় না, ছিয়াম বা হজ্জের জমায়েতেও হয় না। তাই যে সমাজে জিহাদ নেই সে সমাজে ঈমানের দাবী নিয়ে ভণ্ডরাও মুসলমানদের সাথে লুকিয়ে থাকে। উঁই পোকা ভিতর থেকে যেমন খেয়ে ফেলে, এরাও তেমনি মুসলিম উম্মাহকে ভিতরে থেকে ধ্বসিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ্‌র বিধান হল, প্রকৃত ঈমানদার থেকে ভণ্ডদের পৃথক করা। তাই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল?' *(আলে ইমরান ১৪২)*। তিনি আরো বলছেন, 'তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নিবেন তোমাদের মধ্যে কে (আল্লাহর রাস্তায়) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত *(তাওবাহ ১৬)*। অন্যত্র বলা হয়েছে 'তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছ যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ সে অবস্থার মুখোমুখি তোমরা এখনও হওনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও ভয়ানক কষ্ট। তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যে যাতে নবী এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা একথা পর্যন্ত বলেছে যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শুনে নাও আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটবর্তী *(বাকারা ২১৪)*। মুসলমান হওয়ার অর্থ–এ পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় সজ্ঞানে প্রবেশ করা এবং নিজের ঈমানদারীর প্রমাণ রাখা।

মানুষ মাত্রই মর্যাদা খোঁজে। মর্যাদা খোঁজে দেশের রাজা-বাদশাহর সাহায্যকারী হওয়ার মধ্যে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দাহকে মর্যাদা দেন তাঁর নিজের সাহায্যকারী বানিয়ে। মুমিনের জীবনে জিহাদ দেয় মওকা। মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলা আহবান রেখেছেন এভাবে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও' *(ছফ ১৪)*। আর আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে সে পায় মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য এ জীবনে এবং পরকালীন জীবনে। সে প্রতিশ্রুতিটি শুনিয়েছেন এভাবে, 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন *(মুহাম্মাদ ৭)*। মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাহদেরকে তো দিতে চান বিশাল পদোন্নতি। সে পদোন্নতিতে বড় কোন পদ বা কোটি কোটি টাকার বেতন জুটে না, বরং জুটে জান্নাত। যা অনন্তকালের জন্য–যার এক ইঞ্চি ভূমিও দুনিয়ার তাবৎ সোনা-রূপার চেয়েও মূল্যবান।

আলেমদের অপরাধ :

আলেমদের অপরাধ অনেক। তবে বড় অপরাধ, মুসলমানদের থেকে কুরআনের শিক্ষাকেই তারা আড়াল করেছেন। মেঘ যেমন সূর্যকে আড়াল করে তারাও তেমনি ইসলামকে আড়াল করেছেন। তারা শুধু নিজেরাই জিহাদের এ কথা ভুলেননি, বরং সাধারণ মুসলমানদের মন থেকেও আল্লাহ্‌র পরিকল্পিত চূড়ান্ত পরীক্ষার কথাটিই ভুলিয়ে দিয়েছেন। জিহাদের বদলে কুরআন পাঠ, তাসবীহ পাঠ, নফল ইবাদত ও সাধারণ সুন্নাত পালনের মাঝে জান্নাত প্রাপ্তির খোশখবর শুনিয়েছেন। সমাজে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোন ভাষা তাদের মুখে প্রকাশিত হয় না। তাদের কারণেই জিহাদ নিয়ে বেড়েছে সীমাহীন ভ্রষ্টতা। আর এ ভ্রষ্টতার কারণে পরাজয় শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে আসেনি, পরাজয় এসেছে মহান আল্লাহ্‌র দ্বীনের। এবং সেটি খোদ মুসলিম দেশগুলিতে। ইসলামে জ্ঞানার্জন ফরয হলে কি হবে, এসব আলেমগণ পছন্দ করে নিয়েছেন অজ্ঞতার প্রসারকে। সে জন্যই পবিত্র কুরআনকে বুঝার বদলে সেটিকে না বুঝে তেলাওয়াতের রেওয়াজ বাড়িয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন, 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? *(মুহাম্মদ ২৪)*। এ আয়াতে যা অতি সুস্পষ্ট তা হল, আল্লাহ তাআলা অতিশয় অসন্তুষ্ট হন, যদি তাঁর কুরআনী আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা না করা হয়। অথচ আলেমগণ সে চিন্তাভাবনাই অসম্ভব করে তুলেছেন। ফলে মুসলিম সমাজে তেলাওয়াতকারীর সংখ্যা বাড়ছে, ক্বারী ও হাফেযদের সংখ্যাও বাড়ছে, কিন্তু বাড়েনি চিন্তাশীল মুমিনের সংখ্যা। এমন চিন্তাশূন্যতার কারণেই বেড়েছে ইসলাম নিয়ে প্রচণ্ড বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা। মুসলিম দেশগুলিতে মসজিদ-মাদরাসা, ইসলামী বই-পুস্তক ও ইসলামী দলের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বেড়েছে, বেড়েছে ছালাত আদায়কারীর সংখ্যাও। কিন্তু বাড়েনি জিহাদ নিয়ে সঠিক ধারণা। বাড়েনি মুসলমানদের জিহাদে সংশ্লিষ্টতা। ফলে মুসলিম দেশগুলিতে বেড়েছে ইসলামের পরাজয়।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্র থেকে ইসলামের কুরআনী বিধান তার দখলদারী হারিয়ে মসজিদের জায়নামাযে স্থান নিয়েছে। অথচ ইসলামের শরঈ বিধান দখলদারী হারালে মুসলমান কখনো বিজয়ী হয় না, গৌরবও পায় না। আল্লাহ্‌র বিধান কোন দেশের আইন-আদালত থেকে অপসারিত হল আর মুসলমানরা সে দেশে বিজয় ও ইয্‌যত পেল–এমন ইতিহাস কি আছে? মুসলমানের গৌরব তো আসে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসার মধ্য দিয়ে। আর সে সাহায্য তো একমাত্র তখনই আসে যখন মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। তাঁর কুরআনী বিধানকে বিজয়ী করতে শত্রুর সামনের জানমালের কুরবানী নিয়ে খাড়া হয়। মহান আল্লাহ তাআলা তখন তাঁর বান্দাহ্‌র বিশাল বিনিয়োগ দেখে হাযার হাযার ফেরেশতা পাঠান তাদের সাহায্যার্থে। যেমনটি বদর, খন্দক, হুনায়নের ন্যায় বহু যুদ্ধে ঘটেছিল। যেমনটি বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা, যারা সারিবদ্ধভাবে আসবে *(আনফাল ৯)*। আর সাহায্য তো আসে একমাত্র আল্লাহ থেকেই *(আনফাল ১০)*। আর মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসে তখন কোন পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়েও কি কোন বাধা থাকে?

শুধু খুঁটিতে নিরাপত্তা নেই :

ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ, যাকাত–এ হলো ইসলামের পাঁচটি খুঁটি। তবে ঘর নির্মাণে শুধু খুটি নয়, আরো বহু কিছু যরূরী। ইসলামের সে

ঘর নির্মাণে সে অপরিহার্য বিষয়গুলো হল জিহাদ, সমাজ ইসলামী কায়দায় গড়ে তোলা, ন্যায়-ইনসাফ ও শান্তি-সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া ইসলামের খুঁটিই শুধু দাঁড়িয়ে থাকে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ঘর তাতে নির্মিত হয় না। তখন সভ্যতাও গড়ে উঠে না। ঘরে যে অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা জুটে সেটি কি খুঁটির ছায়াতে জুটে? আজকের মুসলমানদের জীবনে সেটিই ঘটেছে। মুসলিম সমাজে শুধু ৫ খানি খুঁটিই কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ঘর নির্মিত হয়নি। ফলে মুসলমানদের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তাও জুটেনি। মুসলমানগণ আজ নিজ দেশে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের শিকার হচ্ছে। অধিকৃত হচ্ছে তাদের নিজ ভূখণ্ড ও সম্পদ। পদদলিত হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা। নবীজীর যুগে শুধু খুঁটি ছিল না, সে খুঁটির উপর ভর করে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান ও আনুসঙ্গিক ইবাদতের সাথে ঈমানদারের জীবনে জিহাদও ছিল। প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ইসলামী শরীআতের। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ইসলামের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। শত্রুর প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। জিহাদ তখন প্রতিটি মুমিনের জীবনে অলংকারে পরিণত হয়েছিল। সে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছিল মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা।

কুরআনী জ্ঞান মানুষকে কেবল সত্যের সন্ধানই দেয় না, তার চেতনারাজ্যে জোগায় অফুরন্ত শক্তি। তখন আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য তার শুধু অঙ্গিকারই বাড়ে না, তার মাঝে আত্মবিনিয়োগ ও অর্থবিনিয়োগের সামর্থ্যও বাড়ে। তখন মুসলিম দেশে শত্রুর প্রতিরোধের তাড়না শুধু বেতনভোগী সৈনিকদের মাঝে সীমিত থাকে না। সমগ্র দেশ তখন ক্যান্টমেন্টে পরিণত হয় এবং প্রতিটি নাগরিক তখন পরিণত হয় সৈনিকে। এমন জিহাদ না থাকলে শয়তানী শক্তির বিশাল কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অনিবার্য। মুসলিম দেশে আজ ক্যান্টনমেন্ট বেড়েছে, সৈনিকের সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে যুদ্ধাস্ত্রও। কিন্তু জিহাদের ধারণা বিলুপ্ত হওয়ায় শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে জনগণের দায়বদ্ধতা ও কোরবানী বাড়েনি। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে ইসলামের কি বিজয় আসবে, দেশ অধিকৃত হয়ে গেছে ইসলামের অভ্যন্তরীণ শত্রুর হাতে।

প্রতিটি মতবাদ বা আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অনুসারীদের অঙ্গিকার চায়, সে সাথে কোরবানীও চায়। ইসলামের প্রতিষ্ঠায় দখল জমিয়ে রাখা আদর্শ ও তার অনুসারীদের হটাতে হয়, হটানোর সে কাজে শ্রমব্যয়, অর্থব্যয় ও রক্তব্যয় ঘটে। অথচ মুসলিম আলেমদের মাঝে আজ সে কোরবানী পেশের আগ্রহ কোথায়? বরং জিহাদ যে প্রতিটি মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক, ইসলামের সে অতি বুনিয়াদি শিক্ষাটিকে তারা অতি সফলতার সাথে আড়াল করতে সমর্থ হয়েছে। অপরদিকে ইসলামী শরীআতের এমন পরাজয়ের মাঝেও তাদের মাঝে এ নিয়ে কোন মাতম বা আহাজারি নেই। সে হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদ এবং সে জিহাদে কোরবানী পেশেরও কোন আগ্রহ নেই। অথচ শয়তানের অনুচরদের কোরবানীটা কত বিশাল। মার্কিনীরা জানমালের বিশাল কোরবানী পেশ করছে নিজ দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের নানা জনপদে। তেমনি প্রাণ দিচ্ছে নানা মতের অনুসারীরা। বাংলাদেশে একমাত্র মুজিব আমলেই প্রায় ৩০ হাজারের বামপন্থী নেতাকর্মী প্রাণ দিয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। অথচ কতজন আলেম প্রাণ দিয়েছেন ইসলামের বিজয় আনতে?

ঈমান দৃশ্যমান হয় জিহাদে :

মুসলমানের ঈমান কথা বলে তাঁর কর্ম, সংস্কৃতি, আচরণ ও রাজনীতির মধ্য দিয়ে। তাঁর সে ঈমান তাঁকে সমাজের অন্যদের থেকে পৃথক করে এবং এক ভিন্ন পরিচয়ে খাড়া করে। সে ভিন্নতা স্রেফ নাম, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ও ইবাদত-বন্দেগীতে নয়, বরং সেটি সৃষ্টিকর্তা, জীবন ও জগত, জীবনের এজেণ্ডা ও মিশন, মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবন, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে স্পষ্টতর এক বিশেষ ধ্যান-ধ্যারণার ভিত্তিতে। ইসলামী পরিভাষায় সে ধ্যান-ধারণাই হল আক্বীদা। আক্বীদা এবং ঈমান অদৃশ্য, কিন্তু কোন ব্যক্তির মধ্যে তা প্রবেশ করলে সেটির প্রবল প্রকাশ ঘটে তার কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে। তখন তার কর্ম, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও রাজনীতিও পাল্টে যায়। এক সার্বিক বিপ্লব আসে তার জীবনে। জিহাদ তখন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়, যেমনটি হয়েছিল ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে। কিন্তু যখন সে বিপ্লব আসে না এবং তার জীবনে জিহাদ শুরু হয় না, তখন বুঝতে হবে বিশাল শূণ্যতা বা ভ্রষ্টতা রয়েছে তার ঈমান ও আক্বীদায়। তাই কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে পরিবর্তন আনতে হয় তাদের আক্বীদায় তথা ধ্যান-ধারণায়। নবুয়ত প্রাপ্তির পর রাসূল (ছাঃ) আমৃত্যু এ কাজটিই করেছেন। সেই ঈমান ও আক্বীদার বিপ্লবের কারণেই প্রতিটি মুসলিম সেদিন মুজাহিদে পরিণত হয়েছিলেন।

দায়িত্ব জিহাদের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করা :

মুসলমানের আক্বীদা বা ধ্যানধারণার ভিত্তি স্রেফ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর বিশ্বাস নয়, বরং সমগ্র জগত এবং সে জগতে বসবাসরত মানবসৃষ্টি নিয়ে আল্লাহর নিজের পরিকল্পনা তথা রোডম্যাপের উপর বিশ্বাসও। ইসলামে সে রোডম্যাপটি হল কুরআনে বর্ণিত সীরাতুল মুস্তাকীম। আর সে বিশ্বাসের সাথে প্রতিটি ঈমানদারের উপর দায়িত্বও এসে যায়। সে দায়িত্বটি হল, মহান আল্লাহর সে রোডম্যাপের পুরাপুরি অনুসরণ। এর মাধ্যমে সমাজে পথভ্রষ্টরা পথ খুঁজে পায়। মহান আল্লাহর সে রোডম্যাপের বিরুদ্ধে যেকোন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতাই কুফরী। তখন বিপর্যয় ও বিফলতা আসে ব্যক্তির জীবনে এবং মৃত্যুর পর গিয়ে পৌঁছে জাহান্নামের আগুনে। জিহাদ হল রাষ্ট্রের বুকে সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণকে জারি রাখার প্রচেষ্টা। যার মধ্যে সে জিহাদ নেই, বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমানও নাই। মুসলিম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল জনগণের মাঝে জিহাদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। যে রাষ্ট্রে লাগাতার জিহাদ নেই, বুঝতে হবে সে রাষ্ট্রে সিরাতুল মুস্তাকীমও নেই। তখন পথভ্রষ্টতা বাড়ে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র জুড়ে। সে সমাজ ও রাষ্ট্রে তখন সুদী ব্যাংক, পতিতাপল্লী, নাচের আসর, মদের আসর ও ব্যভিচারী আঁনাচে কাঁনাচে প্রতিষ্ঠা পায়। তখন সাধারণ মানুষ আত্মসমর্পণ করে এমন পথভ্রষ্টদের কাছে যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহী। তখন দেশ রেকর্ড গড়ে দুর্বৃত্তিতে। আর দুর্বৃত্তির প্রতিটি ঘটনাই তো পথভ্রষ্টতা। আইন-আদালত, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় কাফের তথা পথভ্রষ্টদের নীতি। আর একটি সমাজে দুর্বৃত্তির বিশ্বজোড়া রেকর্ড দেখেই বলা যায় সেদেশে জিহাদ প্রতিষ্ঠা পায়নি। জিহাদ না হলে সমাজে ইসলামের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তখন অসম্ভব হয় দুর্বৃত্তির অবসান। অসম্ভব হয় অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বাঁচা। বহু দেশের মাঝে আজকের বাংলাদেশও তো বস্তুত তেমনই এক দেশ। এমন দেশে ছালাত আদায়কারী ও ছিয়াম পালনকারীর সংখ্যা যতই বেশী থাক, 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' তথা আল্লাহর পথে লড়াই যে ভয়ানকভাবে উপেক্ষিত সেটি বোঝার জন্য কি গবেষণার প্রয়োজন পড়ে? আর মহান আল্লাহর প্রদর্শিত পথের প্রতি এমন নির্বিরাম উপেক্ষা নিয়ে কি জনগণ কল্যাণ পায়? জঙ্গীবাদের প্রতিরোধ করতে যেয়ে জিহাদের মৌলিক স্পিরিটটিই কি হারিয়ে দিতে হবে? জিহাদকে উগ্রতার পোষাক পরিয়ে যে সকল গণ্ডমূর্খরা জিহাদ শব্দটিকে কলংকিত করেছে, তাদের উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিতে পারলেই কি আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়া যাবে? যারা মানুষের সত্যিকার কল্যাণ চায় দুনিয়া ও আখেরাতে, তাদের অন্ততঃ এ নিয়ে গভীরভাবে ভাবা উচিৎ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

মধ্যপ্রাচ্যের এক অনন্য সালাফী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দারুল হাদীছ দাম্মাজ

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

*[প্রাচীন কালে হাযরামাউত নামে খ্যাত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ছা'দা। এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এক মরুময় পাহাড়ী উপত্যকার নাম দাম্মাজ। আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে এই দাম্মাজ ইয়েমেনের একটি অখ্যাত অজপাড়াগাঁ ভিন্ন কিছুই ছিল না। মরুময় এই শহরের অধিবাসীরা সে সময় ছিল শী'আ যায়দিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়েরই একজন সৌভাগ্যবান সন্তান শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সঊদী আরবে পড়াশোনা করতে গিয়ে সুন্নী আক্বীদা গ্রহণ করেন। তখন থেকে দাম্মাজের উষর প্রান্তরে তাওহীদের সজীব চারা গজানো শুরু হয়। শায়খ মুক্ববিল পড়াশোনা শেষ করে সঊদী আরব থেকে ফিরে আসেন ১৯৭৯ সালে। সেই বছরই তিনি নিজ গ্রামে 'দারুল হাদীছ' নামে একটি মাদরাসা চালু করেন। এ মাদরাসার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শায়খ মুক্ববিলের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে দিগ্বিদিক। দাম্মাজের শীআ অধিবাসীরা দলে দলে ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে ফিরে এসে সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করা শুরু করে। ফলে বিগত শতাব্দীর শেষভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি এতই বৃদ্ধি পায় যে, সমগ্র ইয়েমেনসহ বহির্বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য ছুটে আসতে থাকে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে এককভাবে সর্ববৃহৎ সালাফী শিক্ষাগার হিসাবে স্বীকৃত। ফলে দু'দশক পূর্বের অখ্যাত দাম্মাজ গ্রামটি আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত স্থান। এই বিখ্যাত মাদরাসাটি গড়ে উঠার ইতিহাস এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি নিয়েই এবারের বিশেষ নিবন্ধটি। – **নির্বাহী সম্পাদক**]।*

দাম্মাজ পরিচিতি :

ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলে ছাফরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছা'দা যেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এক মরুময় পাহাড়ঘেরা ক্ষুদ্র নগরী দাম্মাজ। এই নগরীর পূর্বদিকে অবস্থিত সঊদী আরবের নাজরান প্রদেশ। ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী এই নগরীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ হাজার। অধিবাসীদের একটা বড় অংশ বহু পূর্ব থেকেই শী'আ যায়দিয়া মতাবলম্বী। আর বাকী প্রায় ৫ সহস্রাধিক অধিবাসী শী'আ মতবাদ পরিত্যাগী সুন্নী ও সালাফী মতাবলম্বী মুসলিম। অল্পসংখ্যক ইহুদীও এখানে বসবাস করত, যারা পরবর্তীতে আমেরিকা ও ইসরাঈলে অভিবাসিত হয়ে চলে গেছে। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে এই শহরেরই সৌভাগ্যবান সন্তান শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল ওয়াদেঈ নগরীর উপকণ্ঠে 'দারুল হাদীছ' নামক একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হিসাবে ধীরে ধীরে সমগ্র ইয়েমেনে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করে এই মাদরাসাটি। ফলে প্রাচীন শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত এই মাদরাসা বর্তমানে কেবল ইয়েমেনেই নয়, বরং বহির্বিশ্বেও ইসলামের মূলধারার জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছাত্রদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এ মাদরাসাকে কেন্দ্র করে অখ্যাত দাম্মাজ শহর আজ পরিণত হয়েছে সুপরিচিত শিক্ষা নগরীতে।

দারুল হাদীছ দাম্মাজের পরিচিতি :

অবস্থান : ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলের বিভাগীয় শহর ছাফরার অন্তর্গত ছা'দা যেলার একটি শহরতলী হল দাম্মাজ। এখানেই দারুল হাদীছ দাম্মাজ অবস্থিত। ছা'দা সিটি থেকে এর দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। গাড়ীতে যেতে আধাঘন্টার পথ। এছাড়া ইয়েমেনের ছান'আ, হাদীদাহ, মা'বার, ইব, যিমার, 'আতামাহ, মাভিয়া, আশ-শাহার প্রভৃতি শহরে এই মারকাযের অধীনস্ত শাখা রয়েছে। দেশের বাইরেও মিসর, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এর কার্যক্রম চালু হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রতিষ্ঠাতা : প্রখ্যাত ইয়েমেনী বিদ্বান শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল ওয়াদেঈ আল-খাল্লালী এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দাম্মাজ উপত্যকার ওয়াদেঈ গ্রামে আলী রাশাদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। দাম্মাজে তখন জ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। নিজ গ্রামে কেবল প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান এবং কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর ২০ বছর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য সঊদীআরব গমন করেন এবং সেখানকার ওলামায়ে কেরামের মজলিসে অংশগ্রহণ করা শুরু করেন। সেখানে তিনি 'ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করার পর এর দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। অতঃপর ইয়েমেনে ফিরে এসে সালাফী দাওয়াত প্রচার করা শুরু করেন। মুখ খুলেন শী'আ আক্বীদার বিরুদ্ধে। ফলে যায়দিয়া ও রাফেযী শী'আদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েন তিনি। এক পর্যায়ে তাদের চাপের মুখে তিনি শী'আদেরই একটি মাদরাসায় ভর্তি হন এবং আরবী ভাষার উপর গভীর দক্ষতা অর্জন করেন। এসময় তিনি আরবী ব্যাকরণের নাহু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বই 'কাৎরুন নাদা' অধ্যয়ন করেন অন্তত ৭ বার এবং তা কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। অতঃপর ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ (১৯৬২-১৯৭০) শুরু হলে তিনি আবার ফিরে যান সঊদী আরবে এবং মসজিদে হারামের মা'হাদে ভর্তি হন। সেখানে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে 'উছূলুদ্দীন' বিভাগে অনার্স এবং 'হাদীছ' বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর হাদীছ, তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে গভীর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় দুই দশক সঊদী আরবে অবস্থানকালে তিনি অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন শায়খ বিন বায, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনুল উছায়মীন, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সোমালী, আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ, মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীতীসহ তৎকালীন সময়ের বড় বড় সকল বিদ্বানদের নিকটে। যদিও তিনি বলতেন, 'আমি আমার শিক্ষকদের নিকট থেকে যত না শিখেছি, তার চেয়ে বেশী শিখেছি সালাফদের রচিত গ্রন্থ পাঠে।' এরপর তিনি নিজেই বিভিন্ন হালাকায় শিক্ষাদান করা শুরু করেন এবং স্বীয় জ্ঞানবত্তার কারণে অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ করেন।

১৯৭৯ সালে তাঁকে সরকারবিরোধী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় এবং কয়েকমাস পর শায়খ বিন বাযের হস্তক্ষেপে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। তবে তাঁকে ইয়েমেনে ফিরতে বাধ্য হতে হয়। ইয়েমেনে ফেরার পর তিনি সালাফী সংস্কারবাদী দাওয়াত প্রচার করা

শুরু করে। এ সময় যথারীতি ইসমাঈলী এবং যায়দী শী'আরা তাঁর চরম বিরোধিতা করে। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ইমামতি করতাম। কিন্তু মুছল্লীরা আমার বামপার্শ্বে দাঁড়াত। আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, শী'আ মারকায মসজিদ 'মাসজিদুল হাদী'র একজন মুফতী আমাদের বলেছেন, যদি কোন মুছল্লী ওয়াহহাবী ইমামের ডানপার্শ্বে দাঁড়ায়, তবে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর আমি সেই মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ের পর মাইক নিয়ে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা শুরু করলাম এবং তাদেরকে ধারণা দিলাম আহলে বায়েতের প্রতি আহলে সুন্নাহ কেমন শ্রদ্ধা পোষণ করে সে সম্পর্কে। কিন্তু লোকেরা আমার বিরুদ্ধে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এমনকি তারা দলবদ্ধ হয়ে উদ্যত হল আমাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করতে। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে আমাকে বাঁচানোর জন্য আমার এক শী'আ আত্মীয় হঠাৎ পিছন থেকে পিস্তল বের করে ফাঁকা গুলি করল। এতে লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি রক্ষা পেলাম সে যাত্রায়। এটা ছিল আল্লাহ্র অসীম রহমত। ঐ শীআ আত্মীয়টি ধর্মীয়ভাবে আমার বিদ্বেষী হলেও বংশীয় ঐতিহ্যবশত সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিল।

এভাবে সকল বিরোধিতা মুকাবিলা করে তিনি তাঁর দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন এবং নিজ জন্মভূমি দাম্মাজে 'দারুল হাদীছ' নামক একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই তিনি জীবনের শেষ ২২ বছর অতিবাহিত করেন এবং মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আগত হাযার হাযার ছাত্রদেরকে পাঠদানে নিয়োজিত থাকেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি আক্বীদা, তাফসীর, হাদীছ ও ফিকহসহ সমসাময়িক বিভিন্ন দল ও মতবাদ সম্পর্কে সমালোচনামূলক ৪০টিরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টায় হাজার বছর ধরে শীআদের একচেটিয়া আদিবাস হিসাবে স্বীকৃত শহর দাম্মাজ আজ পরিণত হয়েছে একটি সালাফী অধ্যুষিত নগরীতে। বর্তমানে দাম্মাজ শহরের অর্ধেকের বেশী অধিবাসীই হল তাঁর মাদরাসায় শিক্ষালাভের জন্য আগত স্থায়ী-অস্থায়ী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি জটিল লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁর ভক্তরা আমেরিকা, জার্মানী পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যান। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় তিনি সঊদী আরবের জেদ্দার একটি হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকেন। অবশেষে ১৪২২ হিজরীর ৩০ রবীউছ ছানী মোতাবেক ২০০১ সালের ২১ জুলাই তিনি জেদ্দাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযা হয় মক্কায় এবং আল আ'দল কবরস্থানে শায়খ বিন বায, শায়খ উছায়মীনের কবরের নিকটবর্তী স্থানে কবরস্থ হন।

'দারুল হাদীছ' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস :

শায়খ মুক্ববিল সঊদীআরব থেকে ফিরে আসার পর নিজ গ্রাম দাম্মাজে ছোট ছোট শিশুদের কুরআন শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন। কিন্তু অসহনীয় বিরোধপূর্ণ পরিবেশ তাকে অচিরেই নিজ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করলো। ফলে নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি ইয়েমেনের বিভিন্ন শহরে তাঁর দাওয়াত নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। ইতোমধ্যে শায়খের সঊদী আরব অবস্থানকালীন সময়ে যে সকল ছাত্র তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের কেউ কেউ তাঁর নিকট শিক্ষালাভের জন্য ইয়েমেনে আগমন করলেন। যাদের অধিকাংশই ছিলেন মিসরীয় এবং সঊদী। তাদের সংখ্যা দশের অধিক ছিল না। শেষ পর্যন্ত এদের সহযোগিতায় জন্মভূমি দাম্মাজেই শায়খ ছোট্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং সেখানেই ছোট শিশু ও বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষায়তন গড়ে তুললেন। এতে গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং আলেম হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবার আশংকায় প্রমাদ গুণল। তারা ভাবল শায়খ মুক্ববিল গ্রামে এসে মাতব্বরী গ্রহণের চেষ্টা করছেন। শায়খ তাদের আশ্বস্ত করলেন কেবলমাত্র ছাত্রদের দ্বীনের সঠিক জ্ঞানদান ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই। এভাবেই শুরু হল আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এই ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানটির অনাড়ম্বর যাত্রা। মদীনায় শায়খের একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল, যা তিনি ইয়েমেনে চলে আসার সময় রেখে এসেছিলেন। পরবর্তীতে এক ছাত্রের সহযোগিতায় তাঁর লাইব্রেরীর সমুদয় গ্রন্থ স্থানীয় শী'আ প্রশাসনের নানা বাধার মুখেও দাম্মাজে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। সমগ্র ইয়েমেনে তাঁর লাইব্রেরীটিই তখন সর্ববৃহৎ এবং সমৃদ্ধতম সংগ্রহশালা হিসাবে বিবেচিত হত। ধীরে ধীরে ছাত্রদের জমায়েত বৃদ্ধি পেতে পেতে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। অখ্যাত এক অজপাড়াগাঁয়ে গ্রামীণ পরিবেশে এত বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখানে এসে ভীড় জমাবে, তা কেউ কল্পনাও করেনি। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বলেন, 'এখানে যা কিছু হয়েছে, তা সবকিছুই আল্লাহ্র একান্ত অনুগ্রহেই হয়েছে। আমাদের ক্ষমতা, জ্ঞানের পরিধি বা ক্ষুরধার বক্তব্য ইত্যাদি কোন কিছুরই ভূমিকা ছিল না এর পিছনে। একমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন বলেই এত কিছু সম্ভব হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি এ প্রতিষ্ঠানে এত বরকত দান করেছেন'।



বর্তমান মুদীর : ২০০১ সালে শায়খ মুক্ববিল মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ওছিয়ত মোতাবেক মাদরাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শায়খ আবু আব্দুর রহমান ইয়াহইয়া বিন আলী আল-হাজূরী। ১৯৬২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় সঊদী আরবে। অতঃপর ১৯৮৫ সালে তিনি শায়খ মুক্ববিলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত কর্মঠ ও বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন হিসাবে তিনি দক্ষতার সাথে এই মারকায পরিচালনা করে চলেছেন।

অবকাঠামো : 'দারুল হাদীছ' পুরোপুরিভাবে একটি মসজিদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় একটি ছোট্ট মাটির মসজিদের মাধ্যমে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শায়খ মুক্ববিলের বাড়ির পার্শ্বে এক বড় আকারের মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্র বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আরো বৃহৎ আকারে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সম্প্রতি এই মসজিদটিকে লাইব্রেরীতে পরিণত করে আরো একটি বিশালাকার মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। দিন-রাত সর্বক্ষণ এই মসজিদ ছাত্র-শিক্ষকে পরিপূর্ণ থাকে। কোথাও ক্লাস হয়, কোথাও ছাত্ররা কুরআন ও হাদীছ মুখস্ত করে, আবার কোথাও নতুন ছাত্ররা আবাসস্থল গেড়েছে। এছাড়া মসজিদের বাইরে কাচা মাটির ইটের তৈরী এটাচ্ড বাথসহ রুম রয়েছে, যেখানে ছাত্ররা ভাড়া দিয়ে থাকে।


মসজিদসহ মূল অবকাঠামো

আবাসন : বর্তমানে প্রায় সমগ্র দাম্মাজ শহর পরিণত হয়েছে ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেলে। পরিবারসহ আগত ছাত্ররা অথবা কয়েকজন মিলে যদি কেউ চায় তবে বাড়ী ক্রয় করতে পারে। সাড়ে তিন লাখ টাকা থেকে সাত লাখ টাকার মধ্যে এসব বাড়ী কেনা যায়। তবে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছলরা সাধারণত পাহাড়ী অঞ্চলে সস্তা দামে জমি কিনে নিজেরাই বাড়ি তৈরী করে নেয়। আর শায়খ মুক্ববিলের ওয়াক্বফকৃত জমিতে নির্মিত বাড়ীসমূহ খালি থাকা সাপেক্ষে ছাত্রদেরকে ফ্রি প্রদান করা হয়। এসব বাড়ীর অধিকাংশই মাটির নির্মিত। পানির ব্যবস্থা থাকলেও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। তবে রাতে কোন কোন জায়গায় জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়। সাধারণভাবে ছোট একটি পরিবারের জন্য মাসিক ৬-৭ হাজার টাকার মধ্যে জীবন-যাপন করা সম্ভব।


ছাত্রাবাস

মাদরাসার নিজস্ব খাদ্য-ব্যবস্থাপনা খুব সাধারণ। সকালে-বিকালে রুটি এবং দুপুরে ভাতের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য ছাত্ররা চাইলে বাইরের হোটেলে কিংবা নিজেরা রান্না করেও খেতে পারে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি : দারুল হাদীছের শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত কোন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগে সালাফে ছালেহীন যেভাবে শিক্ষালাভ করতেন ঠিক সে পদ্ধতিকেই ধরে রাখার চেষ্টা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এমনকি কোন নির্দিষ্ট ক্লাস রুম পর্যন্ত নেই। ক্লাসের জন্য ধরাবাঁধা কোন শিডিউল নেই। সারাদিনই সেখানে ক্লাস নেন শিক্ষকগণ। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শায়খ ইয়াহইয়া আল-হাজূরী দিনে ৩টি ক্লাস নেন। যেখানে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। ক্লাসগুলি হল যোহরের পর ইবনে কাছীর ও ছহীহুল জামে', আসরের পর ছহীহ বুখারী এবং মাগরিবের পর আক্বীদা ও উছূলে ফিকহবিষয়ক গ্রন্থসমূহ। এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের নিয়মিত পাঠ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষকরা নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক ক্লাস গ্রহণ করে থাকেন। মসজিদের উপরতলা মহিলাদের ছালাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত। সেখানে শায়খ মুক্ববিলের দুই স্ত্রী এবং কন্যা উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা মহিলা শাখার ক্লাস নেন। মহিলা শাখা পরিচালনার জন্য তাঁরা ছাড়াও আরো কয়েকজন শিক্ষিকা রয়েছেন। এছাড়া সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে শায়খ ইয়াহইয়া আল-হাজূরীসহ অন্যান্য শিক্ষকদের ক্লাসে ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। মহিলাদের জন্য পৃথক একটি বিরাট লাইব্রেরী রয়েছে, যেখানে তাদের গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের ব্যাপারে এখানে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা দেয়া হয়। সালাফে ছালেহীনের শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণে এখানে মুখস্তবিদ্যার প্রতি গুরুত্ব অত্যধিক। কুরআন হিফয, হাদীছ ও মৌলিক গ্রন্থসমূহের মতন ও ইবারত মুখস্ত করা বাধ্যতামূলক। বলা হয়ে থাকে, সবচেয়ে কম মেধার শিক্ষার্থীরাও এখানে সপ্তাহে গড়ে ২৫টি হাদীছ মুখস্ত করে।

কোর্স শেষে এখানে কোন সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা নেই। শায়খ মুক্ববিল এর জওয়াবদিহিতায় বলেন, 'আমরা এখানে কোন সার্টিফিকেটের জন্য কাজ করি না। আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মাস্টার্স সার্টিফিকেটটি পেয়েছিলাম তা পরে কোথায় রেখেছি, নিজেই জানি না। খুঁজলেও পাব না, কেননা বহুদিন আগেই আমি তা হারিয়ে ফেলেছি'। তাঁরা মনে করেন মুসলিম উম্মাহ মাস্টার্স, পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারীদের ভীড়ে ভরপুর, কিন্তু প্রকৃত দ্বীনদার আলেম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সার্টিফিকেটধারী নয়, বরং খালিছ প্রকৃত আলেম তৈরীর জন্য তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন।

ছাত্রসংখ্যা : এখানে ইয়েমেন ছাড়াও ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ বহির্বিশ্ব থেকে আগমনকারী। বর্তমানে সেখানে দেশী-বিদেশী প্রায় ১২

হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আগত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরা মূলতঃ নবমুসলিম। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া থেকেও অনেক শিক্ষার্থী সেখানে অধ্যয়নরত রয়েছে। লণ্ডনপ্রবাসী কিছু বাংলাদেশীও সেখানে পড়াশোনা করছেন। বিদেশ-বিভূঁই থেকে এসে অনেক শিক্ষার্থীই আবার সপরিবারে বসবাস করছেন কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত কোন বয়সসীমা না থাকায় যে কোন বয়সী জ্ঞানপিপাসুরা এখানে ভর্তি হতে পারে। আর অনিবন্ধিত মাদরাসা হওয়ায় বিদেশী শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট ভিসা পান না। তাই সাধারণত তারা ভিসিট ভিসায় এসে এখানে থেকে যান। তবে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তাঁদেরকে দাম্মাজে অবস্থানকালীন সময়ে সরকারী বাঁধার মুখে পড়তে হয় না। সরকার থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়।

দারুল হাদীছের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য :

(ক) মানহাজ : মানহাজের দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠান কঠোরভাবে সালাহে ছালেহীনের মানহাজ অনুসরণ করেন। প্রতিটি কাজে-কর্মে সুন্নাতকে অনুসরণ করা এবং সকল কিছুর উপর সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার এখানে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে এই ঐতিহ্য বজায় রাখলেও বর্তমানে সেখানকার পরিবেশ অনেকটা মিশ্রিত হয়ে উঠেছে। এজন্য শায়খ রাবী মাদখালী বলেছিলেন, 'যদি তুমি ইলম শিখতে চাও, তাহলে দাম্মাজে যাও'।

(খ) যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) : দাম্মাজের ছাত্ররা এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর পিছনে না ছোটার শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠে। এখানকার আবাসন, খানাপিনা ইচ্ছাকৃতভাবেই খুব সাধারণ মানের। ছাত্ররা অন্যদের মত সার্টিফিকেটের আশায় পড়াশোনা করে না। তারা কুরআন ও সুন্নাহকে স্রেফ এজন্যই অধ্যয়ন করে যে, তারা এর মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি পেতে চায়। এখানে কেবলমাত্র পরকালীন মুক্তির আশায় সুদূর বিদেশ-বিভূঁই থেকে আসা বিত্তশালী ছাত্র-ছাত্রীদের অতি সাধারণ জীবন-যাপন দেখলে সত্যিই মনে হবে তারা যেন উক্ত হাদীছের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে যেখানে বলা হয়েছে, **كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهـــل القبـــور** অর্থাৎ তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন আগন্তুক বা পথচারী মুসাফির, আর নিজেকে গণ্য কর কবরবাসীদের একজন হিসাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৭৪)*।

(গ) ফলপ্রসূ জ্ঞান : পরীক্ষা পাশ করে বা ভাল রেজাল্ট করে দুনিয়াবী কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে চাকুরীর স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে কেবলমাত্র দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্ররা এখানে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে। নিজের প্রয়োজন মত যে কোন গ্রন্থ তারা যোগ্য শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করতে পারে। কোন ছাত্র যদি কোন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে এবং সে বিষয়ে পাঠদান করতে চায় তবে মসজিদের বাইরে পোস্টারে নিজের নাম ও বিষয় লিখে দিতে পারে। এভাবে সে নিজের জ্ঞান বিতরণেরও সুযোগ পায়। জ্ঞানচর্চার উত্তম সুযোগের সাথে সাথে তাদের জ্ঞানার্জন হয় পুরোপুরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে। ফলে দ্বীনের জ্ঞান তাদের মাঝে স্বল্প সময়েই বদ্ধমূল হয়ে উঠে। তাদের লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই নিশানকে সম্বল করে বিশ্বের আনাচে-কানাচে তারা দ্বীনের সঠিক জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন। বিশ্বজুড়ে সালাফী মানহাজের প্রসারে তারা ভূমিকা রাখছেন জোরালোভাবে। ফালিল্লাহিল হামদ।

ইয়েমেনে দারুল হাদীছের প্রভাব :

শায়খের দাওয়াত শুরু হওয়ার পূর্বে ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চল ছিল শী'আ মতবাদের ঘাঁটি এবং দক্ষিণাঞ্চল ছিল ছূফী মতবাদের ঘাঁটি। কিন্তু বর্তমানে এই দাওয়াতের বরকতে সমগ্র ইয়েমেনে আজ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শত শত বছর ধরে লালিত শী'আ ও ছূফী মতবাদের ভ্রান্তি থেকে মানুষ দলে দলে মুক্তির পথ সন্ধান করছে।

এই মারকাযের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছেন। আক্বীদা, ফিকহ, হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের লিখিত বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক। এছাড়া মুশরিক ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে তাদের অবস্থান মধ্যগগণের সূর্যের মতই তেজোদ্দীপ্ত। তাদের সাহসী ভূমিকার কারণে কেবল দাম্মাজ নয়, বরং সমগ্র ইয়েমেন জুড়ে তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র নবআলোর বিকিরণ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

দারুল হাদীছ দাম্মাজ সম্পর্কে কিছু সমালোচনা :

এই মারকাযের বিরোধী কিছু ব্যক্তিরা বলে থাকে যে, এখানকার ছাত্ররা শায়খ ইয়াহইয়া আল-হাজূরীর অন্ধ অনুসারী এবং এখানকার শিক্ষকদের কোন মতের বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। যদি করা হয়, তবে তাকে 'বিদ'আতী' আখ্যা দিয়ে মারকায থেকে বিতাড়িত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, এখানকার শায়খগণ আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধাচারণে সিদ্ধহস্ত ইত্যাদি। তবে এসব অভিযোগ অতিরঞ্জিতই বলা যায়। আর যদি কিছু সত্যতা থেকেও থাকে তবুও এই প্রতিষ্ঠানের সুউচ্চ মর্যাদা এবং মহান খেদমতের সামনে তা নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য।

শেষকথা : বর্তমান বিশ্বে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ সালাফী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম করতে হয়, তবে প্রথমেই আসে 'দারুল হাদীছ দাম্মাজ'-এর নাম। সারা বিশ্বে সালাফী আন্দোলনের যে ব্যাপ্তি ঘটছে এবং মানুষের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে যে সচেতনতা জাগ্রত হচ্ছে, তার পিছনে এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রয়েছে অসামান্য অবদান। সাথে সাথে দ্বীনের সঠিক শিক্ষাগারের সন্ধানে আজও যে বহু মানুষ উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, দাম্মাজের মত অখ্যাত দুর্গম অজপাড়াগাঁয়ে এবং এই সুপ্রাচীন কারিকুলামের মাদরাসায় দেশ-বিদেশের এত ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ তাই প্রমাণ করে। এখানে নেই কোন স্বাস্থ্যকর আবাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। নেই কোন পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা। নেই কোন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি বা উন্নত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। এমনকি স্থায়ী ভিসা পাওয়াও অসম্ভব। তবুও মানুষ এখানে ছুটে আসছে যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমা বিলাসবহুল লাইফস্টাইল থেকে আসা বহু ছাত্ররাও এখানে নিতান্ত দীনহীনের বেশে দিন কাটাচ্ছে কেবলমাত্র সঠিক দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের আশায়। কেবল একটা দ্বীনী পরিবেশে সন্তানদের মানুষ করার জন্য ইউরোপ-আমেরিকার অনেক পরিবার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে হিজরত করে চলে আসছে এখানে। এসবই প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের অন্তরে কতটা স্থান করে নিয়েছে এই মাদরাসা। আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন এবং বিশ্বের আনাচে-কানাচে পথহারা মানুষের কাছে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার তাওফীক দিন। আমীন!!

যুবসমাজের কতিপয় সমস্যা

-মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

আধুনিক যুগে যুবসমাজের মধ্যকার সমস্যা নিয়ে এই লেখাটি লিখতে আমি স্বস্তিবোধ করছি। কেননা এটি এমন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা কেবল ইসলামী সমাজেই নয় বরং প্রতিটি সমাজে বিদ্যমান। বর্তমান যুবসমাজ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিকভাবে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে যা তাদেরকে প্রায়শই জীবন সম্পর্কে একধরনের উৎকণ্ঠায় নিক্ষিপ্ত করছে। এ দুঃশ্চিন্তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং এই হতাশাময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা চেষ্টাও করছে যথাসম্ভব। তবে এটা সত্য যে, ধর্মীয় অনুভূতি ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন ব্যতীত তাদের এই প্রচেষ্টা কখনোই সফল হবে না। কেননা এ দুটির উপরই মানব সমাজ ভিত্তিশীল। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এর মাঝেই। যাবতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং অনিষ্টতা ও বিপদাপদকে দূরীভূত করার জন্য এ দু'টি মূলনীতির অনুশীলন অপরিহার্য।

একটি দেশ যেমন কখনো তার অধিবাসী ছাড়া বসতিপূর্ণ হয় না, তেমনিভাবে দ্বীন তার অনুসারী ছাড়া প্রতিষ্ঠা পায় না। আর যখনই দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় দ্বীনদাররা দণ্ডায়মান হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, তাদের শত্রু যেমনই হোক না কেন, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 'হে ঈমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করবেন। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ এবং তিনি তাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন *(মুহাম্মদ, ৪৭/৭-৮)*।

যেহেতু দ্বীন তার অনুসারী ব্যতীত প্রতিষ্ঠা পায় না, সেহেতু আমরা যারা মুসলিম এবং ইসলামের পতাকাবাহী তাদের জন্য অত্যাবশ্যক কর্তব্য হল, নিজেদেরকে প্রথমে নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং শক্তি ও সৌভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠা। আর সেজন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যা বাকচারিতায়, কার্যকলাপে এবং দিক-নির্দেশনাদানে এবং মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে। ফলে সত্যানুসন্ধানী ও বাতিলপন্থীদের সম্মুখে ধারালো হাতিয়ার ও স্বচ্ছ আলোকঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হবে।

এর পরের কাজ হল এ অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবের ময়দানে প্রয়োগ করা। এর এতে যেন আমাদের ঈমান, দৃঢ়বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণ প্রকাশ পায়। কেবল বক্তব্যই যেন সার না হয়। কেননা বক্তব্যের যথার্থতা যদি কর্মে প্রতিফলিত না হয়, তখন বক্তব্য কেবল আড়ম্বরই থেকে যায়। তাতে নেতিবাচক ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক *(ছফ ৬১/২,৩)*।

সবচেয়ে ভাল হয় নতুন করে পথচলা শুরু করে আমাদের যুবকদের চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে পারলে, যেন তাদের মধ্যকার ভালোগুণ গুলোকে বৃদ্ধি এবং খারাপসমূহকে সংশোধন করে দেয়া যায়। কেননা আজকের যুবকরা আগামী দিনের পুরুষ। তাদের উপরই নির্ভর করছে উম্মতের ভবিষ্যৎ। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাদেরকে উত্তমভাবে প্রতিপালন করা এবং তাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এমন বিষয়াদির প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ এই যুবসমাজের মাঝে যখন সংস্কার আসবে এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যখন তাদের জীবন গড়ে উঠবে, তখন অচিরেই জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচিত হবে এবং আমাদের নেতাদের যোগ্য উত্তরসূরী তৈরী হবে ইনশাআল্লাহ।

যুবকদের পরিচয়

যুবকদেরকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলে আমরা সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

ক. সুপথগামী যুবক খ. বিপথগামী যুবক গ. দিশেহারা যুবক ।

সুপথগামী যুবক

এই যুবক সেই মুমিন যুবক যে মুমিন শব্দটির অর্থ পুরোপুরি বহন করে। এরা তারা যারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল, দ্বীনকে ভালবাসে, দ্বীনে পরিতৃপ্ত থাকে, আনন্দিত হয়, দ্বীনকে গণীমত হিসাবে গণ্য করে এবং দ্বীন থেকে বঞ্চিত থাকাকে সুস্পষ্ট ক্ষতির কারণ মনে করে।

তারা এমন যুবক যারা শিরকমুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব করে। যারা কোনকিছু করা বা না করার ক্ষেত্রে রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কথা ও কাজকে অনুসরণ করে এই বিশ্বাসে যে, তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং অনুকরণীয় মডেল।

তারা এমন যুবক যারা সাধ্যমত পরিপূর্ণতার সাথে ছালাত ক্বায়েম করে, কারণ তারা ছালাতের উপকারিতা, দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফলাফলের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। তারা জানে ছালাত পরিত্যাগে ব্যক্তিগত ও জাতিগত কি ভয়াবহ কুপরিণাম নিহিত আছে।

তারা এমন যুবক যারা হক্বদারদের প্রতি যাকাত আদায় করে পূর্ণভাবে, কেননা তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হিসাবে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণে যাকাতের ভূমিকার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

তারা এমন যুবক যারা শীতে-গ্রীষ্মে সর্বদাই রামাযানের ছিয়াম পালন করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও লালসাকে নিবারণ করে। কেননা তারা বিশ্বাস করে এতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। তাই নিজের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে তারা প্রাধান্য দেয়।

তারা এমন যুবক যারা বায়তুল্লায় ফরজ হজ্জ আদায় করে। কেননা আল্লাহকে যেহেতু তারা ভালবাসে কাজেই আল্লাহর ঘরকেও তারা ভালোবাসে। ভালবাসে রহমত ও মাগফেরাতপ্রাপ্তির স্থানসমূহে যেতে এবং সেখানে প্রত্যাগত মুসলমানদের সাথে শরীক হতে।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহকে নিজেদের এবং আসমান-জমীনের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করে। কেননা তারা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীতে এমন কিছু টের পায় যা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ রাখে না। সুবিশাল আকারবিশিষ্ট অনুপম ও সুশৃংখল মহাজগতের মধ্যে একজন মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টিকর্ম, অসীম ক্ষমতা ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট

প্রমাণ তারা লক্ষ্য করে। কেননা এ জগত নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার মাধ্যমেও এর জন্ম হয়নি। কেননা অস্তিত্বলাভের পূর্বে এটা ছিল অস্তিত্বশূন্য। আর অস্তিত্বশূন্য জিনিস কোন অস্তিত্ববান জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না, কেননা তার তো নিজেরই অস্তিত্ব নেই।

আবার আকস্মিকভাবে অস্তিত্বলাভেরও কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা এ মহাবিশ্ব এমন এক অপরিবর্তনীয়, সুশৃংখল ও নিখুঁত নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে যার কোন ব্যত্যয় নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً 'আর তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও কখনো দেখবে না *(ফাতির, ৩৫/৪৩)*। مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 'দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে আবার তাকিয়ে দেখ, কোন খুঁত কি দেখতে পাও? অতঃপর তুমি দুই বার করে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে *(মুলক ৩-৪)*।

এই অপূর্ব সুশৃঙ্খল ও সুসমন্বিত মহাবিশ্ব হঠাৎ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবির্ভূত হয়েছে–এটা কখনই সম্ভব নয়। যদি তাই হত তবে এর গোটা ব্যবস্থাপনাও হত আকস্মাৎ, ফলে তাতে যে কোন মুহূর্তে চরম বিশৃংখলা ও বিপর্যয় নেমে আসত।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহর ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কেননা আল্লাহ কুরআনে তাদের কথা বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহে তাদের গুণাবলী, ইবাদত ও সৃষ্টিজগতের কল্যাণে তাদের তৎপরতা সম্পর্কে যা বিবৃত হয়েছে তা-ই তাদের বাস্তবিক অস্তিত্বকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি আস্থাশীল হয় যেগুলি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণের প্রতি নাযিল করেছিলেন মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। কেননা কেবল মানবিক জ্ঞানশক্তির মাধ্যমে ইবাদাত ও মুআমালাতের বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব নয়।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহর নবীগণ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখে যাদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সৃষ্টিজগতের প্রতি। এসকল নবীদের দায়িত্ব হল, তারা মানবজাতিকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করেন। যাতে করে মানবজাতি আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন কোন হুজ্জত বা আপত্তি প্রকাশ করতে না পারে। নূহ (আঃ) ছিলেন প্রথম রাসূল এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ।

তারা এমন যুবক যারা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যেদিন মানুষকে উত্থিত করা হবে। যেখানে তাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবন দান করা হবে এই কারণে যেন তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল বুঝিয়ে দেয়া যায়। আল্লাহ বলেছেন– فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে *(যিলযাল, ৯৯/৭,৮)*। কেননা যদি সৃষ্টির জন্য এমন কোন দিন না থাকে যেদিন সৎব্যক্তিদের জন্য পুরষ্কার এবং অসৎব্যক্তিদের জন্য পাপের শাস্তি দেয়া হবে, তাহলে এই দুনিয়াবী জীবনের যথার্থতা ও তাৎপর্যটা কি?

তারা এমন যুবক যারা তাক্বদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা প্রতিটি ঘটনার কারণ ও প্রতিফলে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস করে সবকিছুই আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ মোতাবেকই ঘটে। তারা জানে প্রতিটি সৌভাগ্যের পিছনে যেমন কারণ নিহিত, তেমনি দুর্ভাগ্যের পিছনেও কারণ নিহিত রয়েছে।

তারা এমন যুবক যারা দ্বীনকে নছিহত হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। তারা মুসলিমদের সাথে দ্ব্যর্থহীন ও খোলামেলা জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়, যেমন আচরণ সে অন্যদের কাছে প্রত্যাশা করে। যেখানে থাকে না কোনরূপ ধোঁকা, শঠতা, প্রতারণা ও গোপনীয়তার লেশমাত্রও।

তারা এমন যুবক যারা আল্লাহর পথে আহ্বান করে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন– ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করো উত্তমরূপে' *(নাহল ১২৫)*।

তারা এমন যুবক যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, এতেই জাতি ও উম্মতের সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 'তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম উম্মতরূপে উদ্ভূত হয়েছো, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে *(আলে ইমরান ১১০)*।

তারা এমন যুবক যারা রাসূল (ছাঃ)-এ দেখানো পদ্ধতি মোতাবেক মন্দকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, من رأى منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه কেউ যদি খারাপ কিছু হতে দেখে তাহলে সে যেন তা হাত দ্বারা বদলিয়ে দেয়, যদি হাত দিয়ে সম্ভব না হয় তাহলে তার কথার মাধ্যমে বদলানোর চেষ্টা করে, যদি তাও না পারে তাহলে অন্তরে পরিবর্তনের কামনা করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

তারা এমন যুবক যারা সত্য কথা বলে এবং সত্যকে গ্রহণ করে। কেননা সত্য ন্যায়পরায়ণতার দিকে পথ দেখায়, আর ন্যায়পরায়ণতা জান্নাতের পথ দেখায়। কোন ব্যক্তি যে সত্য বলে এবং সত্যের অনুসন্ধানে থাকে, সে পরিশেষে আল্লাহর দরবারে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

তারা এমন যুবক যারা সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করে। কেননা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সেই বাণীর প্রতি ঈমান রাখে, যেখানে তিনি বলেছেন– والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার অন্য ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬১)*।

তারা এমন যুবক যাদের আল্লাহর প্রতি এবং নিজ দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ রয়েছে। তারা সর্বদা আত্মকেন্দ্রিকতাকে দূরে ঠেলে নিজের ধর্ম, সমাজ ও জাতির কল্যাণ কল্যাণে প্রচেষ্টা চালায়। তারা অন্যের কল্যাণের প্রতি তারা লক্ষ্য রাখে সেভাবেই যেভাবে নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

তারা এমন যুবক যারা কেবল আল্লাহর জন্যই আল্লাহর পথে একনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করে। কোন লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের আকাংখা তাদের থাকে না। তারা আপন শৌর্য-বীর্যের উপর নির্ভরশীল হয় না বা আত্মপ্রসাদে ভুগে না। বরং সবসময় আল্লাহর পথে কেবল

আল্লাহরই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে জিহাদ করে। আল্লাহর পথে সংগ্রাম চালানোর সময় তারা সম্পূর্ণভাবে দ্বীনের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। কখনও বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা প্রদর্শন করে না। আর ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তারা প্রয়োজনমত নিজের বাকশক্তি, অস্ত্রশক্তি ও ধনসম্পদ ব্যবহার করে সংগ্রাম চালায়।

তারা এমন যুবক যারা চরিত্রবান ও দ্বীনদার। তারা মানুষের চরিত্র সংশোধনকারী। তারা দ্বীনের ব্যাপারে সুদৃঢ়, কোমল ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, স্বচ্ছহৃদয় ও ধৈর্যশীল। তবে এমন বিচক্ষণ যে কোন সুযোগকে নষ্ট করে না এবং বিবেক ও সংস্কারবোধের উপর আবেগকে প্রাধান্য দেয় না।

তারা এমন যুবক যারা সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত। যারা কাজ করে প্রজ্ঞার সাথে এবং মৌনভাবে। যাদের কাজে দক্ষতা ও উৎকর্ষতার ছাপ বিদ্যমান। যারা তাদের জীবনের অবসর সময়গুলোকে বিনষ্ট করে না বরং ব্যস্ত রাখে এমন কাজে যা তাদের নিজের জন্য এবং জাতির জন্য উপকার বয়ে আনে।

সাথে সাথে এই যুবকরা নিজের ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও চাল-চলনের হেফাযতকারী হয়। আর নিজেদেরকে সর্বান্তকরণে দূরে রাখে কুফরী, নাস্তিকতা, পাপাচার, নাফরমানী, দুশ্চরিত্রতা ও অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে।

এই শ্রেণীর যুবকরা হল জাতির গর্ব। তারা জাতির জন্য সৌভাগ্য ও জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠে। জাতীয় মূল্যবোধ তাদের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে। তারাই তো সেই যুবক যাদের জন্য আমরা অহর্নিশ আল্লাহর কাছে কামনা করি, যেন আল্লাহ তাদের বদৌলতে ইসলাম ও মুসলমানদের চলমান দুরবস্থাসমূহ সংশোধন করে দেন এবং সত্যের পথিকদের পথচলাকে দীপ্তিমান করেন। তারাই তো সেই যুবক যারা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে আনতে পারে।

বিপথগামী যুবক

এই যুবক এমন যুবক যার আক্বীদা বিভ্রান্ত, আচরণ বেপরোয়া এবং সে আত্মম্ভরিতায় মগ্ন এবং নোংরা কার্যকলাপে নিমজ্জিত। সে অন্যের নিকট থেকে সত্য গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় এবং নিজেও বাতিল, অগ্রহণযোগ্য কাজ থেকে নিবৃত হতে রাজী নয়। তার আচার-আচরণ স্বার্থপর, যেন সে কেবল দুনিয়ার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং দুনিয়াও শুধুমাত্র তার একার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

এই ধরনের উদ্ধত যুবক কখনও সত্যের প্রতি নমনীয় হয় না এবং বাতিল অপসারণেও তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে আল্লাহর হক্ব নষ্ট হল কি না হল সে ব্যাপারে কোন পরওয়া করে না, পরওয়া করে না মানুষের হক্ব নষ্ট হল কিনা সে ব্যাপারেও। এই নৈরাজ্যবাদী যুবক তার চিন্তা-চেতনায় সাজুয্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তার সকল কাজে-কর্মে এবং চলার পথে পরিমিতিবোধ খুইয়ে ফেলছে। নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সে এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়ে, যেন সত্যই তার কথার উপরে চালিত হয়। সে যেন সকল ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত একজন নিষ্পাপ মানুষ। আর যারা তার বিরোধিতা করে তারা যেন সব ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির মাঝে পড়ে আছে।

এই যুবক এমন যুবক যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছিরাতে মুস্তাকীমের পথ থেকে বিচ্যুত, সামাজিক নীতি-ঐতিহ্য হতে পথভ্রষ্ট। অধিকন্তু তার নোংরা অপকর্মগুলি তার কাছে সুশোভিত হয়ে উঠে। তাদের ব্যাপারে এটাই বলা যে, তারা হল ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত যারা দুনিয়াবী জীবনে তাদের সকল আমল বরবাদ হওয়ার কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত আমলদাররে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথচ তারা ধারণা করে যে তারা সৎকর্ম করছে।

সে নিজেই নিজের জন্য অমঙ্গল এবং সমাজের জন্য আপদ হয়ে দাঁড়ায়। জাতিকে সে টেনে নিয়ে যায় অধঃপতনের অতল তলে। প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে দেয় জাতির মান-মর্যাদার উপর। সমাজকে সে এমন এক জীবাণুযুক্ত ও প্রতিকারবিহীন ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করে যা থেকে কেবল আল্লাহ ইচ্ছা ব্যতীত কেউ উদ্ধার করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

দিশেহারা যুবক

এমন যুবক যে নানা পথ ও মতের মাঝে উদ্ভ্রান্ত-দিশেহারা হয়ে থাকে, অথচ সে হক্বকে চিনেছে ও তাতে প্রশান্তি লাভ করেছে এবং একটি রক্ষণশীল সমাজে লালিত পালিত হয়েছে। তবে সকল দিক থেকে অনিষ্টতার দরজাসমূহ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। যেমন আক্বীদাকে ঘিরে সন্দেহের আবর্ত, চাল-চলনের অধঃপতন, আমলের বিকৃতি, পূর্বকাল থেকে চলে আসা নীতি-নৈতিকতার গণ্ডিমুক্ত হওয়া, বাতিলের নানামুখী স্রোত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক দুষ্টচক্র ইত্যাদি। বাতিলের এই প্রবল স্রোতের মুখে সে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না। সে বুঝতে পারে না এই সমস্ত চিন্তাধারা, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতিতে যা কিছু প্রতীয়মান হচ্ছে তা-ই কি সত্য, না কি যে নীতির উপর তার পূর্বপুরুষগণ বা তার রক্ষণশীল সমাজ ছিল তা-ই সত্য? এই গোলকধাঁধাঁয় পড়ে সে দিশেহারা ও উৎকণ্ঠিত হয়ে গেছে এবং একবার এটা, আরেকবার ওটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

এই শ্রেণীর যুবক তার জীবনে একটা নেতিবাচক অবস্থানে থাকে। ফলে সে এমন একজন শক্তিশালী আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী হয়, যে তাকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে। তাই আল্লাহ যখন তার জন্যে একজন উত্তম, প্রজ্ঞাপূর্ণ, জ্ঞানধারী ও চমৎকার পরিকল্পনা সম্পন্ন একজন দাঈকে ন্যস্ত করে দেন, তখনই সেটা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে এই শ্রেণীর যুবকের সংখ্যাই সমাজে বেশী। তারা ইসলামী সংস্কৃতির কিছু ছোয়া পেয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে অন্যান্য দুনিয়াবী শিক্ষা লাভ করেছে যা প্রকৃতপক্ষে বা তাদের ধারণামতে দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে। ফলতঃ তারা দ্বিমুখী দুই সংস্কৃতি বা সভ্যতার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

তাদের জন্য এই হতভম্ব অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে সমগ্র জীবনাচরণে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বীজ রোপণের মাধ্যমে এবং খুলূছিয়াতসম্পন্ন ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ মূল উৎস হতে এই সংস্কৃতি শিক্ষালাভের মাধ্যমে। আর এ কাজটি তাদের জন্য খুব কঠিন নয়।

যুবকদের বিভ্রান্ত হওয়া ও তার সমস্যা

যুবকদের বিভ্রান্ত হওয়ার এবং সমস্যায় আপতিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন যখন একজন মানুষ যৌবনে উপনীত হয় তখন তার শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কেননা এসময় সে জীবনের বাড়ন্ত বেলা অতিক্রম করে। ফলে তার মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধনটা হয় খুব দ্রুতগতিতে। সুতরাং জীবনের এই পর্যায়ে তার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের সূত্রগুলি প্রস্তুত রাখা এবং তার খামখেয়ালীপনাকে লাগাম পরানো ও ছিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে তাকে পরিচালিত করার জন্য হেকমতের সাথে নেতৃত্ব দেয়া অতীব যরূরী।

যুবকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মৌলিক কারণসমূহ

১. অবসর : চিন্তা-চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি বিনষ্টের জন্য অবসর হল একটি ধ্বংসাত্মক ব্যধি। যেহেতু কর্মতৎপর ও কর্তব্যনিষ্ঠ থাকাটা মানুষমাত্রেই অপরিহার্য। কেননা মানুষের যখন কাজ থাকে না

তখন তার চিন্তা-ভাবনায় আলস্য সৃষ্টি হয়, বুদ্ধিমত্তা স্থূল হয়ে পড়ে ও হৃদয়ের উদ্দীপনা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মনের সে শূন্যস্থান দখল করে নেয় কুমন্ত্রণা ও নোংরা চিন্তা-ভাবনা। ফলে এই শ্বাসরুদ্ধকর কর্মহীন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সে কখনো কখনো এসব নিকৃষ্ট কুচিন্তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ফেলে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যা করণীয় তা হল, অবসর সময়কে অলসভাবে না কাটিয়ে নিজের জন্য উপযোগী কোন কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। হতে পারে তা পড়াশোনা, ব্যবসা, লেখনী বা অনুরূপ এমন কিছু যা দিয়ে সে নির্বিঘ্নে অবসর কাটাতে পারে এবং নিজের সফলতা অর্জন ও অপরের সেবার মাধ্যমে সমাজে নিজেকে একজন কর্মঠ ও যোগ্য সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২. পরিবার এবং পরিবারের বাইরে যুবক ও বয়স্কদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা : কতিপয় প্রবীণ লোকদের দেখা যায় যারা যুবকদের মাঝে অথবা অন্য কারোর মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করার পর তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন এবং দিশেহারা হয়ে ক্ষান্ত হয়ে যান। তাদের এই মনোভাব যুবকদের অন্তরে ক্রোধ ও অবাধ্যতার জন্ম দেয় এবং তারা ভাল নাকি খারাপ কাজ করছে সে ব্যাপারে সর্বাবস্থায় বেপরোয়া ভাব দেখায়। এসময় বয়স্করা প্রায়শই সব যুবককে এক পাল্লায় বিচার করে বসেন এবং প্রত্যেক যুবক সম্পর্কে এক ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সমাজটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং যুবক ও বয়স্করা প্রত্যেকেই পরস্পরকে হেলাফেলার দৃষ্টিতে দেখে এবং তুচ্ছ জ্ঞান করে। যা অবশেষে এক বিরাট সমস্যার রূপ নিয়ে সমাজকে পরিবেষ্টিত করে রাখে।

এই সমস্যার প্রতিবিধান হল যুবক ও বয়স্ক প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান এই বিচ্ছিন্নভাব ও দূরত্ব দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। প্রত্যেককে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যুবক ও প্রবীণ সকলকে নিয়েই সমাজ একটি অভিন্ন দেহ। যদি তার কোন একটি অঙ্গে ক্ষয় দেখা দেয়, সর্বাঙ্গজুড়ে তা বিস্তৃত হয়। একইভাবে প্রবীণদের বুঝতে হবে যে, যুবকদের প্রতি তাদের স্কন্ধে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। তাই এসব যুবকদের সংশোধনের স্বার্থে হৃদয়ে চাপা হতাশাগুলোকে দূরীভূত করতে হবে। আর জেনে রাখতে হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। কত পথহারাকে তিনি সুপথ দেখিয়েছেন, যারা পরে নিজেরাই মানুষের জন্য হেদায়াত ও সংস্কারের জন্য আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়েছে।

আর যুবকদের জন্য অবশ্য করণীয় হল প্রবীণদের প্রতি তাদের অন্তরে সম্মানের একটা স্থান রাখা। তাদের উপদেশকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া এবং তাদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলা। কেননা জীবনের বাস্তবতা থেকে এবং অভিজ্ঞতা থেকে তারা যা সঞ্চয় করেছেন, যুবকদের তা নেই। আর এবাবে যখন প্রবীণদের প্রজ্ঞা ও নবীনদের শক্তির মাঝে সুসমন্বয় ঘটবে তখনই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমাজ সমৃদ্ধির পানে ধাবিত হবে।

৩. পথভ্রষ্ট লোকজনের সাথে চলা-ফেরা ও সখ্যতা রাখা : এই বিষয়টি যুবকদের মস্তিষ্কে, চিন্তা-চেতনা জুড়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এজন্যই মহানবী (ছাঃ) বলেছেন المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়। অতএব তোমাদের উচিৎ কার সাথে বন্ধুত্ব করছ সে ব্যাপারে খেয়াল করা *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৯)*।

তিনি আরও বলেছেন ঃ مثل الجليس السوء كنافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه رائحة كريهة 'খারাপ বন্ধুর উপমা হচ্ছে কামারের হাপরে ফুঁক দানকারীর ন্যায়। হয় তা তোমার কাপড়কে পুড়িয়ে দিবে অথবা তা হতে তুমি দুর্গন্ধ পাবে' *(বুখারী হা/২১০১ ও ৫৫৩৪, মুসলিম, হা/২৬২৮, মিশকাত হা/৫০১০)*।

এর প্রতিবিধান হল, একজন যুবককে এমন কারো সঙ্গ বেছে নিতে হবে যে হবে কল্যাণকামী, সৎ ও বুদ্ধিমান, যেন তার গুণাবলী থেকে সে উপকৃত হতে পারে। এমনিতেই মানুষ তাদের সহচরদের সাথে উঠা-বসা করার পূর্বেই তাদের বাহ্যিক হাল-চাল ও সুখ্যাতি দেখে আকৃষ্ট হয়ে যায়। যদি সেই সহচরগণ হয় চরিত্রবান, মহৎ ও সরল-সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদি হয় সুনামের অধিকারী, তবে তারাই হল সেই ইপ্সিত, বহুকাঙ্খিত ও গণীমতের সম্পদতুল্য মানুষ, যাদেরকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখা আবশ্যক। আর যদি অন্যথা হয়, তবে তাদের থেকে সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখা অপরিহার্য যেন তাদের মিষ্টি বাকচাতুর্যে এবং বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোঁকা না খেতে হয়। কেননা এইসব খারাপ লোক ধোঁকা-প্রবঞ্চনা ও ভ্রষ্টপথ অনুসরণের মাধ্যমে সহজ-সরল জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। এর মাধ্যমে তারা তাদের দলভারী করতে চায় এবং তাদের ভিতরকার নিকৃষ্ট দিকগুলো ঢেকে রাখে। কবি কতই না চমৎকারভাবে বলেছেন,

أبل الرجال إذا اردت إخائهم وتوسمن أمورهم وتفقد

فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فيه اليدين قرين عين فاشدد

তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও তাদেরকে আগে পরীক্ষা করে নাও আর তাদের এমন কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত কর যা তোমার মাঝে নেই।

অতঃপর যখন তুমি কাউকে পাও বুদ্ধিমান, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি হিসাবে যার রয়েছে চক্ষুশীতলকারী বন্ধুত্বের বাড়ানো দু'খানা হাত, তখন সে বন্ধুত্বকে আঁকড়িয়ে ধরবে।

৪. ধ্বংসাত্মক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করা : এ সকল বই-পত্র মানুষকে তার ধর্ম ও ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, যা তাদেরকে পরিচ্ছন্ন চরিত্র হতে অপবিত্র নিকৃষ্ট চরিত্রের দিকে ঠেলে দেয় যা খুব সহজেই তারা কুফরী ও ঘৃণ্য পাপে নিক্ষেপ করে। সুতরাং যদি যুবকদের মাঝে সত্য-মিথ্যা ও উপকারী-অপকারী বস্তুর মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারার মত দ্বীনী সংস্কৃতির গভীরতা না থাকে এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চেতনার সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা না থাকে, তবে তারা এসব বই-পত্র পড়ে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এই ধরনের বই-পুস্তক অধ্যয়ন যুবকদেরকে পতনের শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। কেননা যুবকদের বিবেক-বুদ্ধির উর্বরভূমিতে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এসব বই-পুস্তকের চিন্তাধারাসমূহ আক্রমণ করে এবং মজবুতভাবে গেড়ে বসে যাবতীয় শিকড় ও ডাল-পালা নিয়ে। আর এভাবে তাদের জীবন ও জ্ঞানের মতিগতিকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে।

এই সমস্যার সমাধান হল, এ জাতীয় বই-পুস্তক থেকে দূরে থেকে ঐ সকল বই-পুস্তক অধ্যয়ন করতে হবে, যা হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসার বীজ বপন করে। ঈমান ও সৎআমলের প্রতিফলন ঘটায়। আর বিশেষত এর উপরই ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। নতুবা হৃদয়জগতে অচিরেই আগের পড়া বইগুলো পুনরায় পড়ার জন্য তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অন্যান্য উপকারী গ্রন্থসমূহ পাঠের বিষয়টি তার কাছে বিরক্তিকর ও বোঝাস্বরূপ মনে হতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্যে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় তার সংযমের বাঁধ নস্যাত হয়ে যেতে পারে। যার শেষ পরিণাম হতে পারে আমোদ-প্রমোদ আর বিনোদনে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

উপকারী গ্রন্থসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আল্লাহর কিতাব, আর যা ওলামাগণের লিখিত ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক ও সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ। অতঃপর সে সব গ্রন্থসমূহ যা লিখেছেন আলেমগণ এই দু'টি উৎস অবলম্বনে। ***(ক্রমশঃ)***

সাক্ষাৎকার

*['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**'র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে **মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও নূরুল ইসলাম**]*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তর প্রদেশ ভ্রমণ

উত্তর প্রদেশ হ'ল ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ ও আহলেহাদীছের একটি উর্বর এলাকা। এখানে যেমন মুসলমান বেশী, তেমনি আহলেহাদীছও বেশী। আহলেহাদীছ-এর বড় বড় নয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা আমরা থিসিসে দিয়েছি। তন্মধ্যে জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস হ'ল সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ। এটাকে আমরা উত্তর প্রদেশে আহলেহাদীছের প্রবেশদ্বার বলতে পারি। দিল্লীতে কাজ শেষ করে ৮.১.৮৯ইং তারিখে ট্রেন যোগে উত্তর প্রদেশের বানারস রওয়ানা হলাম। ভারতীয় ট্রেন বাংলাদেশের চাইতে অপ্রশস্ত। সম্ভবত ন্যারো গেজ লাইন। ভিতর দিয়ে চলাফেরা খুবই সমস্যা। তার উপরে বাহির থেকে বগি চেনা যায় না। ফলে আমি তড়িঘড়ি করে একটা বগিতে উঠে পড়ি। আমার সীট কয়েক বগি পরে। কিন্তু কিতাবের বোঝা নিয়ে কিভাবে যাব? শেষে একজন যাত্রী দয়াপরবশ হয়ে সীট ছেড়ে আমার সীটে চলে গেলেন। লম্বা পথ ভ্রমণ করে বানারস পৌঁছলাম।

বানারস : রেলস্টেশনে মুণীরুদ্দীন (কিষাণগঞ্জ) ও বেলাল হোসায়েন (রসূলপুর, নওগাঁ) আসার কথা। কিন্তু কাউকে পেলাম না। অবশেষে কুলি নিলাম। গেইট পার হওয়ার সময় পুলিশে আটকালো। বুঝলাম মতলব খারাপ। মাথায় খুন চেপে গেল। বুদ্ধি করে ইংরেজীতে কড়া ধমক দিলাম। সে ভয় পেয়ে ক্ষমা চাইল। ভাবল আমি বড় কোন রাজনৈতিক নেতা বা অফিসার হব। বাইরে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে মাদরাসায় চলে গেলাম। ওরা দু'জন আমার পিছে পিছে এসে পৌঁছল এবং আমাকে পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল। এই মাদরাসা হ'ল ভারতে



'দারুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ'

আহলেহাদীছদের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ' (প্রতিষ্ঠা : ১৩৮৩ হিঃ/১৯৬৩ খৃঃ)। পাশেই 'বানারস হিন্দু ইউনিভাসিটি'। অন্য পাশে হিন্দুদের তীর্থভূমি গয়া-কাশি। সেখানেও একটা মসজিদ এবং নিয়মিত ছালাত হয়। সামনে ইউনিভার্সিটির প্রাচীর ঘেঁষে শত শত মূর্তি খাড়া করা। বিক্রির জন্য। হতভাগারা এগুলো কিনে সেখানে ফুল দিবে। শ্রদ্ধা দেখাবে। মনের কামনা পেশ করবে। মানুষ যে কতবড় মূর্খ হয়, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

মাদরাসার প্রধান ফটক পেরিয়ে ভিতরে গেলাম। শায়খুল জামে'আহর সাথে সাক্ষাৎ হল। ভাল মানুষ। থাকা-খাওয়া ব্যবস্থা হয়ে গেল। রঈসুল জামে'আহ ডঃ মুকতাদা হাসান আযহারীর সঙ্গে পরদিন দেখা হ'ল। তিনি অবাধে লাইব্রেরী ওয়ার্ক করার ও বই ফটো করার অনুমতি দিলেন। অনেক দুর্লভ বই পেলাম। জীর্ণ-শীর্ণ এসব বই ফটো করা মুশকিল। তবুও লাইব্রেরী সহকারী যুবকটি খুবই আন্তরিকতার সাথে বাহির থেকে ফটো করে এনে দিল। নওয়াব ছাহেবের অনেক বই যা একেবারেই দুর্লভ। সেগুলি নিতে পেরে স্বস্তিবোধ করলাম। পরদিন জুম'আ ছিল। খুশী হ'লাম এই ভেবে যে, ভারতের নামকরা প্রতিষ্ঠানে আজ জুম'আ পড়ব ও খুৎবা শুনব। কিন্তু হতাশ হ'লাম। চার পাশে বিল্ডিংভরা ছাত্র-শিক্ষক। তার মাঝেই মসজিদে খুৎবা হচ্ছে ওজস্বিনী ভাষায়। অথচ মুছল্লী নেই। আমাকে দিয়ে গড়ে ১০/১২ জন মুছল্লী। বাকীরা জামা'আত দাঁড়ানোর পর আসল। আমার সহ্য হলো না। সরাসরি শায়খুল জামে'আহকে ধরে বসলাম। উনি দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এবার মুণীরকে নিয়ে গেলাম পাশেই বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। উদ্দেশ্য লাইব্রেরী। গোল বাঁধল গেটে গিয়ে। বিশাল উঁচু স্বরস্বতীর মূর্তি। মেইন গেইটের দু'পাশে দুই খাম্বার উপরে দেবীর দুই পা। দুই পায়ের নীচ দিয়ে যেতে হবে। আমি রিকশা থামিয়ে নেমে গেলাম। মুণীরকে বললাম, অন্য কোন গেইট আছে কি-না। নযর পড়ল, পাশের ছোট সাইড গেইটের দিকে। কোনমতে একজন যাওয়া যায়। ঢুকে গেলাম ঐ পথে। প্রহরী পুলিশ হতবাক হয়ে দেখল। মুণীর ভয় পেয়ে গেল। ইশারায় ডেকে নিলাম। পুলিশগুলো কিছু বলল না। মুণীর ভয়ে ভয়ে ঢুকে বলল, ভাই বিদেশে এসে এরূপ করবেন না। কিছুদিন আগে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে। বললাম আল্লাহ সব জায়গায় থাকেন। তিনিই সর্বোত্তম পাহারাদার।

ভিতরে ঢুকে খেয়াল হ'ল এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা পিএইচডি করতে আসেন। দেখি কাউকে পাওয়া যায় কি-না। ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে গিয়ে খোঁজ করতেই কয়েকজনকে পেয়ে গেলাম। তাদের মাধ্যে ভূগোলের আব্দুল ওয়াহহাব ভাই (ঝিকরগাছা, যশোর) আমার বেশী কাছের। তাকে নিয়ে লাইব্রেরীতে গেলাম। তার আগে উনি বললেন, ভাই! রাজশাহী-বেনারস সব জায়গায় আপনার একই পোষাক? এটা তো হিন্দু ইউনিভার্সিটি। বললাম, আপনার ভয় লাগলে থাকুন, আমি একাই যাচ্ছি। বেচারা লজ্জা পেয়ে সাথে এলেন। নীচে বসা এসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান। অভ্যাসবসে তাকে সালাম দিলাম। উনি সালামের জওয়াব দিলেন। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন লাইব্রেরিয়ান। তিনি সরাসরি আমার দিকে আসছেন দেখে তাকেও সালাম দিলাম। উনিও সালাম নিলেন। দু'জনেই এবার কথা বলতে শুরু করলেন। *আপ শায়েদ বাংলাদেশী হ্যাঁয়? বললাম, জী হাঁ। বললেন, জনাব! এয়সে পোষাক আওর দাড়ি লে কার কোঈ প্রফেসর আ কার হাম কো সালাম কাহনা শায়েদ এহী পহেলা মরতবা হ্যায়। হামারা মোর্দা ঈমান তাযা হো গিয়া হ্যায়। আজ হাম খোদ আপ কি খিদমত কারেঙ্গে*। এরপরেও আমি হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উভয়ে বলে উঠলেন, *হাম নাচীয মোর্দা মুসলিম হ্যায়,*

লেকিন পোষাক মেঁ হাম হিন্দু হ্যাঁয়। হাম কো মাফ ফরমাইয়ে। বললাম, মেরা সাথী এহ প্রফেসর ভি বাংলাদেশী হ্যায় আওর মুসলমান হ্যায়। বললেন, উনকে পাস দাড়ি ভি নেহী হ্যায়, পোষাক ভি নেহী হ্যায়, কেয়সে সামঝোঁ কে ওহ মুসলিম হ্যায়? আব্দুল ওয়াহহাব বললেন, ভাই! আপনার সাথে আসতে ভয় পাচ্ছিলাম, এখন ভয় কেটে গেছে। হাঁ আব্দুল ওয়াহহাব এর পর থেকে দাড়ি রেখেছেন এবং তার লাইফেও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে অল্প দূরেই গয়া-কাশি দেখতে গেলাম। পাশেই মসজিদ দেখলাম।

আযমগড় : অতঃপর এখানে দুইদিন থেকে লাইব্রেরীর কাজ সারার পর ১০.১.৮৯ ইং তারিখে বেলালকে সাথে নিয়ে আমরা আযমগড় মুবারকপুর রওয়ানা হ'লাম। এখানে আমরা মাদরাসা 'আরাবিয়াহ দারুত তা'লীম (প্রতিষ্ঠা : ১৯০৬, সংস্কার : ১৯৮৭)-এর মেহমান হ'লাম।



মাদরাসা 'আরাবিয়াহ দারুত তা'লীম

বিকালে শিক্ষক-ছাত্রদের সাথে বৈঠক করলাম। আহলেহাদীছ-এর আকীদা ও আমল এবং এর দাওয়াত ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলাম। ওনারা এতই খুশী হলেন, মনে হ'ল এধরনের বক্তব্য ওনারা প্রথম শুনলেন। আবেগে তাঁরা অনেক কথা বললেন। সন্ধ্যার পরে গেলাম মিশকাতের বিশ্বখ্যাত আরবী ভাষ্যগ্রন্থ মির'আতুল মাফাতীহ (مرعاة المفاتيح)-এর লেখক জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর (১৯০৪-১৯৯৪ খৃঃ) বাসায়। ছোট একতলা সাধারণ একটা কুঁড়েঘরের মত বাড়ী। হারিকেন নিয়ে এগিয়ে এসে নিজেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ছোট-খাট সাইজের মানুষ। নিরহংকার, সাদাসিধে। চাকর-বাকর নেই। সন্তানাদি কাউকে দেখলাম না। নিজেই আমাদের নাশতা করালেন। এমনকি নিজেই উঠানে গিয়ে টিউবওয়েল চেপে পানি আনলেন। বেলালকে সুযোগ দিলেন না। বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতি জেনে খুশী হলেন।

জামা'আত শেষে দলবদ্ধ মোনাজাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে না-সূচক জবাব দিলেন ও সুন্দরভাবে মুহাদ্দিছসুলভ ব্যাখ্যা দিলেন *(সাক্ষাৎকারটি দ্রঃ আত-তাহরীক ১৪/২, পৃঃ/৩৩ নভে'১০ সংখ্যা)*। এরপর চলে এলাম। ভাবতে লাগলাম, যার অমূল্য গ্রন্থ ছাপিয়ে প্রকাশকরা কোটিপতি বনে গেছেন, অথচ তাঁর জীবনযাত্রার মান এতই সাধারণ!! আফসোস! যাঁদের মেধায় দ্বীন বেঁচে আছে, তাদের কোন মূল্যায়ন তাদের জীবদ্দশায় মানুষ করেনি।

এবারে গেলাম ভারতের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক কাযী আতহার মুবারকপুরীর বাসায়। সালাম-কালামের পর বিদায় হ'লাম সকালে একসাথে ওনার কর্মস্থলে যাব বলে। ফিরে এলাম মাদরাসা আরাবিয়াহ দারুত তা'লীমে। গিয়েই তথ্য জানলাম যে, এখানেই মুহাদ্দিছ আবদুর রহমান মুবারকপুরীর বাড়ী। চমকে উঠলাম শুনে। একেবারে মসজিদের সাথে লাগানো চুন-সুরকির দেওয়াল ও টালীর ছাউনী দেওয়া একতলা অক্ষত বাড়ীটা। এই বাড়ীতে বসেই তিনি জামে'


আবদুর রহমান মুবারকপুরীর বাড়ী। পাশেই মসজিদ

তিরমিযীর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী (تحفة الأحوذي) লিখেছেন। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিলাম সকাল বেলা। এই পরিবারেরই সদস্য মুহাদ্দিছ আবদুল সালাম মুবারকপুরী ও পরবর্তীতে আর-রাহীকুল মাখতূমের (الرحيق المختوم)-এর বিখ্যাত রচয়িতা আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, যাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল পরে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খিদমাতুস সুন্নাহ' বিভাগে, যখন তিনি সেখানে গবেষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

পরদিন ১১ই জানুয়ারী সকালে মাদরাসার পরিদর্শন খাতায় মন্তব্য লিখে বিদায় হ'লাম। অতঃপর কাযী আতহার মুবারকপুরীর বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে হেঁটেই রওয়ানা হ'লাম তাঁর কর্মস্থল দারুল মুছান্নেফীন-এর দিকে। তিনি আমাকে তাঁর লেখা গ্রন্থ رجال السند والهند সহ আরও তিনটি মূল্যবান বই উপহার দিলেন। বইয়ের শীর্ষে স্বহস্তে আমার নামে তাঁর পক্ষ হ'তে হাদিয়া লিখে দিলেন। এমনকি দারুল মুছান্নেফীনের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ফটোগ্রাফ আমাকে দিলেন। এখানে আসার পথে একটা মজার ঘটনা ঘটল। মাওলানা সহ আমরা তিনজন হেঁটে আসছি। মাঝপথে ১০/১২ জন তরুণ ছাত্র পাশ দিয়ে চলে গেল। সবাই টুপী ও লম্বা পাঞ্জাবী পরা। আশ্চর্য হ'লাম ওরা কেউ সালাম দিল না, এমনকি আমাদের দিক থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গল্প করতে করতে চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। ওদের ডাকার উপক্রম করতেই মাওলানা আমার হাত চেপে ধরলেন। বললাম আমি ওদের ডেকে শিক্ষা দিতে চাই। উনি বললেন, খবরদার একাজ করবেন না। ওদের হুযুররা জানতে পারলে সবগুলোকে মাদরাসা থেকে বের করে দেবে। কেননা ওরা ব্রেলভী। আর আমি হ'লাম দেওবন্দী। আমার সঙ্গে ওদের সালাম-কালাম নিষিদ্ধ। আমি হতবাক হয়ে বললাম, হিন্দুস্তানে এটাই কি আলেমদের চরিত্র! কেবল দাড়ি-টুপীতে এরা মুসলমান? আচরণে মুসলমান নয়? উনি বাংলাদেশের কথা শুনে খুশী হ'লেন।

মুবারকপুর শহরটিকে 'প্রতিভাপুরী' বলা যেতে পারে। এখানে আহলেহাদীছ প্রতিভাগুলির মধ্যে রয়েছে আবদুস সালাম মুবারকপুরী, আবদুছ ছামাদ মুবারকপুরী, আবদুর রহমান মুবারকপুরী, ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর মত বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছগণ। অন্যদিকে দেওবন্দী প্রতিভার মধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাযী আতহার মুবারকপুরী, ব্রেলভী প্রতিভার মধ্যে হাবীবুর রহমান আ'যমী প্রমুখ।

আযমগড়ের 'দারুল মুছান্নেফীন' হল মাওলানা শিবলী নো'মানী ও মাওলানা সুলায়মান নাদভীর স্মৃতিধন্য ভারতের একটি বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম। এর মুখপত্র 'আল-মা'আরেফ' গবেষণা মাসিক এখনো চালু আছে। আমার সফরের সময় কাযী আতহার

মুবারকপুরী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সীরাতুন্নবী ও সীরাতে নু'মানের প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন মাওলানা শিবলী নো'মানী। আর 'আরযুল কুরআন' ও 'আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত'-এর স্বনামধন্য লেখক ছিলেন মাওলানা সুলায়মান নাদভী। উভয়ে এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত যোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের গবেষণা কক্ষটি পূর্ববৎ রয়েছে। চেয়ার-টেবিল দোয়াত-কলম সবই আগের মত। সেখানে কেউ বসেন না শ্রদ্ধার কারণে। অথচ সব ঝকঝকে তকতকে। বুঝা গেল নিয়মিত দেখাশুনা করা হয়। পাশের কক্ষে আতহার মুবারকপুরী বসেন। আমি ওখানে আব্দুল মুঈদ নাদভীকে পেলাম। তিনি ওখানে বসে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর (১৮৬৮-১৯৪৮খৃঃ) উপরে গবেষণাপত্র লিখছেন। প্রকাশ পেলে আমাকে পাঠাবেন বলেছিলেন। কিন্তু পাইনি। মাওলানা ছানাউল্লাহ্‌র বিভিন্নমুখী প্রতিভার উপর যদি কোন বাংলাভাষী সত্যিকার অর্থে গবেষণা করত, তাহ'লে জ্ঞানের একটা স্বর্ণদুয়ার এদেশের মানুষের জন্য খুলে যেত। কিন্তু সেরূপ আন্তরিক ও জ্ঞানপিপাসু যোগ্য ছাত্র পাব কোথায়?

মউনাথভঞ্জন : ১১ই জানুয়ারীতে আযমগড় 'দারুল মুছান্নেফীন' থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোজা উত্তর প্রদেশের মউ রওয়ানা হলাম। আহলেহাদীছ-এর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। মউনাথভঞ্জন বলে পরিচিত এই শহরে আহলেহাদীছ মাদরাসা ৩টি ও হানাফী মাদরাসা ১টি। যার নাম মিফতাহুল উলূম। সবগুলিই বড় বড়। আহলেহাদীছের সবচেয়ে প্রাচীন মাদরাসা হ'ল জামে'আ আলিয়া আরাবিইয়াহ, যা ১২৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এর সুদৃশ্য তোরণে আরবী ও হিন্দীতে বড় করে মাদরাসার নাম লেখা আছে। এরপরে হ'ল জামে'আ ইসলামিয়া ফায়যে 'আম। যা ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এটিই এখন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এরপর নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ মহিলা মাদরাসা ও হাসপাতাল। যা মাওলানা মোখতার নদভীর (১৯৩০-২০০৭ খৃঃ) মাধ্যমে সম্ভবতঃ কুয়েতী অর্থ সাহায্যে নির্মিত হচ্ছে। ফায়যে 'আম-এর ছাদরুল মুদার্রেসীন মাওলানা মাহফূযুর রহমান আমাকে সাথে নিয়ে সব দেখালেন। অতঃপর তাকে নিয়ে মেফতাহুল উলূমেও গেলাম। দেখলাম হানাফী মাদরাসা হলেও সেখানে অনেক আহলেহাদীছ ছাত্র পড়াশুনা করে। তার মধ্যে যুবসংঘের 'কর্মী' ঢাকা মাদ্রাসাতুল হাদীছের সাবেক ছাত্র আবুল ফযল (গোদাগাড়ী)-কে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। বগুড়ার আব্দুল্লাহ ফারূকও এখানকার ছাত্র। শিক্ষকদের সাথে বসলাম। তাদের ব্যবহারে প্রীত হলাম। ফায়যে 'আমে রাত কাটালাম।



জামে'আ আলিয়া আরাবিইয়াহ

লাইব্রেরী ওয়ার্ক ছাড়াও অনেক মৌখিক তথ্যবলী সংগ্রহ করলাম। বাঙ্গালী ও বিহারী ছাত্রদের ভিড় জমে গেল। তাদের কাছ থেকে তাদের এলাকায় আহলেহাদীছ-এর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিলাম। মাওলানা মাহফূযুর রহমান রীতিমত বন্ধু বনে গেলেন। আমি চলে আসার পরেও তিনি তাঁর লিখিত একটি বই আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

১৩.১.৮৯ ইং তারিখ সকালে আমরা মউনাথভঞ্জন থেকে রওয়ানা হয়ে বানারস চলে এলাম। অতঃপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখান থেকে ট্রেনে একাকী কলিকাতা রওয়ানা হ'লাম।

পশ্চিম বঙ্গ ভ্রমণ :

১৪.১.৮৯ ইং সন্ধ্যার কিছু আগে কলিকাতা শিয়ালদহ রেল স্টেশনে নামলাম। শিয়ালদহ নামটা শুনেই প্রাণটা ছ্যাৎ করে উঠল। কেননা এখানেই আমার মেজভাই নূরুল্লাহিল কাফী ছাত্রাবস্থায় ট্রেন থেকে নামার সময় পা পিছলে নীচে পড়ে যান এবং ট্রেন চলতে শুরু করলে তিনি কাটা পড়ে সেখানেই মারা যান। তাঁর লাশটা পর্যন্ত আমার আব্বা-আম্মা দেখতে পাননি। কেননা টেলিগ্রাম পান অনেক পরে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন-আমীন!

ভেবেছিলাম মাওলানা আয়নুল বারী এখানে আমাকে রিসিভ করবেন। কেননা দিল্লী থেকে ১২ দিন আগে তাঁকে চিঠি পোষ্ট করেছিলাম। পরে শুনলাম ওদেশের ডাক ব্যবস্থা এতই খারাপ যে দিল্লীর চিঠি ১৫ দিনেও কলিকাতায় পৌঁছে না। যাই হোক একাকী বইয়ের দু'তিনটা বড় বড় প্যাকেট ও হাত ব্যাগসহ কুলি নিয়ে বাইরে এলাম। ১নং মারকুইস লেন, মিছরীগঞ্জ জামে মসজিদ আমার গন্তব্যস্থল। ট্যাক্সি আমাকে জায়গামত নামালো। মসজিদের গেইটেই নামলাম। ভিতরে ঢুকতেই একজন মাওলানা ছাহেবকে পেয়ে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি সালাম দিয়ে দৌড়ে বাইরে গেলেন ও ট্যাক্সি থেকে মালামাল নামিয়ে তাকে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। আমি হতবাক। ইতিমধ্যে মসজিদের ইমাম ও দু'একজন এসে আমাকে ইমামের কক্ষে নিয়ে গেলেন। পরে পরিচয় নিলাম। উনি হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন নাদভী। শিক্ষক, ভাদো মাদরাসা এবং সহ-সম্পাদক মালদহ যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছ। উনি আমার লেখনীর সাথে পরিচিত। দেখলাম সকল প্রকার খেদমতের জন্য উনিই যথেষ্ট। মাওলানা আয়নুল বারী সন্ধ্যার পরে এলেন। আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে রাতেই আমাকে নিয়ে গেলেন কলিকাতার বহু প্রাচীন গ্রন্থাগার তাঁতীবাগানের ২৬-এ নূর আলী লেনে অবস্থিত হাজী আবদুল্লাহ লাইব্রেরীতে। এখান থেকেই সর্বপ্রথম বাংলা ১৩০৮ মোতাবেক ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২ খৃঃ)-এর সম্পাদনায় আহলেহাদীছদের প্রথম দু'পাতার মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ১৯০৩ সালে মাওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮ইং) হাতে ন্যস্ত হয়। পত্রিকাটি পরে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। পরদিন কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গেলাম।

বর্ধমান : ১৭.১.৮৯ ইং তারিখে চললাম কোলকাতা ছেড়ে বর্ধমানের পথে। সেখানে মাওলানা নে'মতুল্লাহ (১৮৫৯-১৯৪৩ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র কুলসোনা মাদরাসা অবস্থিত। যে ঘরে বসে তিনি দরস দিতেন, সেই দোতলা মাটির ঘরটি এখন 'কল্যাণঘর' নামে পরিচিত। মাটির দেওয়াল ও খুঁটির উপর খড়ের চালে আগের মতই ঘরটি দাঁড়িয়ে আছে। যা এখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। যোগ্য উত্তরাধিকারী বা কর্মতৎপর সংগঠন না থাকলে বড় বড় আলেমদের স্মৃতি এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্ধমান যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের তাবলীগ সম্পাদক মৌলবী মোযাম্মেল হক (৬০) আমার সাথে থেকে মাওলানার ব্যক্তিগত লাইব্রেরী দেখার সুযোগ করে দিলেন। পাশেই তাঁর রেখে যাওয়া মাদরাসাটি এখন পাকা হয়েছে। সেখানেও গেলাম এবং শিক্ষক ও মুরব্বীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিলাম।

নদীয়া : রাতে কলিকাতা ফিরে এসে পরদিন ১৮.১.৮৯ ইং তারিখে গেলাম আরেক দিকপাল মুনশী ফছিহুদ্দীন (মৃঃ ১৯০০খৃঃ)-এর গ্রাম নদীয়া যেলার বড় চাঁদঘরে। যিনি ছিলেন পয়ার ছন্দে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মাডডার বাহাছনামা 'ছায়ফল মোমেনিন' নামক পুঁথি কাব্যের স্বনামধন্য লেখক। সেখান থেকে ফিরে ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরীতে গেলাম। প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক শহীদুল্লাহ খুব খুশী হ'লেন ও তাঁর স্বলিখিত কয়েকটি বই উপহার দিলেন।

মুর্শিদাবাদ : পরদিন ২০.১.৮৯ ইং তারিখে গেলাম মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। সেখান থেকে মাওলানা মেছবাহুদ্দীনকে সাথে নিয়ে আশপাশের আহলেহাদীছ মারকাযগুলিতে সফর করলাম। এসময় মাওলানা ইসহাক মাদানী (৩৬) তাঁর ভ্যাসপায় করে আমাকে ধুলিয়ান সহ অনেক স্থানে নিয়ে গেছেন। ২২ তারিখে গেলাম বেলডাঙ্গা, হলদী, দেবকুণ্ডে এবং ২৩ তারিখে গেলাম ভাবতার বিখ্যাত জমিদার হাজী আব্দুল আযীযের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, মাদরাসা ও কুতুবখানা দেখতে। সেখানে গিয়ে মাসিক আহলেহাদিস পত্রিকার ১ম সংখ্যা থেকে (১৩২৩ বাং) এক বছরের বাঁধাই করা দুর্লভ সংগ্রহটি পেলাম। তারা খুশীমনে দিলেন। কেননা কুতুবখানায় এখন পাঠকের বড়ই আকাল। দোতলা জীর্ণ-শীর্ণ বিল্ডিং।

মালদহ : ২৪ তারিখে লালগোলা ও ধুলিয়ান থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ২৫ তারিখে গেলাম মালদহের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামে'আ মাযহারুল উলূম বাটনা মাদরাসায়। মাওলানা মোসলেম রহমানী (৭১) তখন মুহতামিম। খুবই সমাদর করলেন। শুনলাম আব্দুল মতীন সালাফী এখানে একসময় ছাত্র ছিলেন। দুর্ভাগ্য প্রতিষ্ঠানের পশ্চিম পার্শ্বে খারেজী মাদরাসার বিপরীতে পূর্ব পার্শ্বে আলিয়া মাদরাসা গড়ে উঠেছে নতুনভাবে। মাওলানা দুঃখ করলেন। বাংলাদেশেও একই হাওয়া বইছে। ঐদিন রাতে গেলাম পার্শ্ববর্তী ভাদো মাদরাসায়। পরদিন সেখানে ক্লাসটাইমে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর বক্তব্য রাখি। অতঃপর তথ্যাদি সংগ্রহ করি।

পশ্চিম দিনাজপুর : পরদিন ভাদো মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মাদ হোসেন নাদভীকে সাথে নিয়ে চলি পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহার থানাধীন মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী (৭৯)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। কেননা উনিই হ'লেন চাপাই নবাবগঞ্জের নারায়ণপুরের আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নেতা রফিক মণ্ডলের সার্থক জীবন্ত উত্তরসুরী। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারী সেখানে থাকি এবং তাঁর পুরা বক্তব্য নোট করি। পরদিন যাই আব্দুল মতীন সালাফীর পৈত্রিক বাড়ী করণদীঘি থানাধীন ভুলকি গ্রামে। তার পিতা যোগ্য আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান ও অন্যান্য মুরব্বীদের কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করি। এরপর কলিকাতা ফিরে যাই এবং সেক্রেটারী মাওলানা আয়নুল বারীর নিকট থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর পক্ষ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করি। এরপর এশিয়াটিক সোসাইটিতে যাই। এরপর প্রাদেশিক জমঈয়ত সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম খানের (৭৬) কলিকাতা-১১ এর ৫২, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড-এর বাড়ীতে গিয়ে তথ্য নেই।

উত্তর ২৪ পরগণা : অতঃপর তাঁর গ্রামের বাড়ী উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপদহা থানাধীন ঐতিহাসিক হাকিমপুর মারকাযে যাই ৩.২.৮৯ ইং তারিখে। সেখানকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আযান দিলে ছোট্ট সোনাই নদীর পশ্চিম পাড়ে বাংলাদেশের উত্তর ভাদিয়ালীর লোকেরা শুনতে পায়। মনটা বারবার ব্যাকুল হয়ে উঠছিল যে, ছোট্ট একটু সীমানা পেরিয়ে ওপারে নিজ দেশে যেতে পারছিনা কেবল পরদেশে থাকার কারণে। মানুষের তৈরী এই ভেদরেখা কখনোই হৃদয়ের আকর্ষণ ছিন্ন করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, সোনাই নদীর দু'পাশের মুসলমানেরা প্রায় সবাই আহলেহাদীছ মূলতঃ হাকিমপুর মারকাযের বরকতে।

পরদিন কলিকাতা ফিরে এলাম। অতঃপর কাঠমণ্ডু ফ্লাইটের টিকেট কেনার জন্য বের হ'লাম। পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি ধর্মসভার দিকে একাকী। পুলিশের বেশধারী একজন আমাকে ডাকল। হাতে হ্যান্ডব্যাগ ছিল। কাছে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টাকাগুলো সব বের করে নিল। অতঃপর চাকু বের করে বলল, *চলে যাও, বাত মাৎ কারো।* সবই হ'ল চোখের পলকে। ভদ্রবেশী পুলিশ চলে গেল। আমিও চলে এলাম ধীর পায়ে মিছরীগঞ্জ মসজিদে। ভুল করেছিলাম একাকী গিয়ে। পরে জানলাম ওটা পুলিশ নয় ঠগ। এটা কলিকাতার নিত্য দিনের ঘটনা। পরদেশী বুঝতে পারলে ওরা পিছে লাগে। খালাতো ভাই আব্দুর রব কানাড়া ব্যাংকে চাকুরী করে। মুসলিম লীগের তুখোড় নেতা। আমার সমবয়সী। ওকে গিয়ে বললাম। নিয়ে গেল আলীপুর থানায়। জিডি করলাম। ব্যস! ঐ পর্যন্তই। এরপর সন্ধ্যায় মেটিয়াবুরুজ হালদারপাড়া মসজিদে গেলাম। এখানে মাওলানা আয়নুল বারীর বাড়ী। মসজিদেই সাক্ষাৎ হ'ল। তারপর চলে এলাম। এভাবে ভারতে আমার ৩২ দিনের স্টাডি ট্যুর শেষ হ'ল।

নেপাল ভ্রমণ

কাঠমাণ্ডু : স্টাডি ট্যুরের শেষ পর্যায়ে সার্কভুক্ত তিনটি দেশের সর্বশেষ নেপালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম ৬ই ফেব্রুয়ারী'৮৯ইং তারিখে।


কাঠমুণ্ডু এয়ারপোর্ট

মধ্যাহ্ন সূর্য মাথায় নিয়ে দুপুর ১২-টা ২০ মিনিটে কাঠমাণ্ডুর ত্রিভূবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামলাম। পাহাড়ঘেরা বিমানবন্দরটি যেন দেয়াল ঘেরা খেলার মাঠ। আমাদের বিমানটি হঠাৎ গাছ-গাছালী দিয়ে সাজানো পাহাড়ের মধ্যে টুপ করে ডুবে গেল ও হাঁপিয়ে গিয়ে টারমাকে দাঁড়িয়ে গেল। নতুন দেশ নতুন অভিজ্ঞতা। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গেলাম কাঠমণ্ডু শহরের ঘণ্টাঘর দেউবন্দী জামে মসজিদে। সেখানে মসজিদের ৪২ বছর যাবৎ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ হায়াত দেউবন্দীর মেহমান হ'লাম। পাশেই একটা মুসলিম খাবার হোটেল পাওয়া গেল। ফলে সমস্যা হয়নি। মাওলানার হেফাযতে আমার ব্যাগ-ব্যাগেজ রেখে পরদিন ঝাণ্ডানগর রওয়ানা হ'লাম।

ঝাণ্ডানগর : কাঠমাণ্ডু থেকে সড়ক পথে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে কপিলবস্তু যেলায় অবস্থিত ঝাণ্ডানগর। এখানেই ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেপালের সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম মাদরাসা সিরাজুল উলূম। যা একই সঙ্গে নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। পাশেই কৃষ্ণনগর শহর। মাদরাসায় পৌঁছে বাদ মাগরিব ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে মাদরাসার প্রধান ফটকের ছবি তুললাম। ভারতের উত্তর প্রদেশের বঢ়নী রেল স্টেশনের উত্তর পার্শ্বে ৫ হাতের মধ্যে মাদরাসাটির মূল ফটক ও বিল্ডিং শুরু। মাদরাসার পোষ্ট অফিস হ'ল বঢ়নী। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। মনেই হয় না যে দু'টি পৃথক দেশ। ভারত ও নেপালের খতীবুল হিন্দ মাওলানা আব্দুর রঊফ


সিরাজুল উলূম-এর প্রধান গেইট

ঝাণ্ডানগরীর পিতা এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তিনি এর পরিচালক। সাথে সাথে রাবেতা আলমে ইসলামীর একমাত্র নেপালী সদস্য। তাঁকে পেলাম না। অন্যান্য শিক্ষকরা সাহায্য করলেন। রাতে আব্দুল্লাহ মাদানীদের তাজ এম্পোরিয়াম কাপড়ের দোকানে গেলাম কৃষ্ণনগর বাজারে। তাঁর দেওয়া সুন্দর ছোট্ট নেপালী তোয়ালেটো আমার রেডিওর ঢাকনা হিসাবে আজও রয়েছে। রেডিওটা আব্দুল মতীন সালাফী ঢাকা থেকে ২৭০০ টাকায় কিনে আমাকে হাদিয়া দেয় সম্ভবত ১৯৮৫ সালে। '৯৭ সালে তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে উনারা আমার নওদাপাড়ার বাসায় এলে ছোট বইয়ের আলমারীর উপরে রক্ষিত এক হাদিয়ার উপরে আরেক হাদিয়া দেখে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিলেন। আজ যখন এসব লিখছি, তখন আব্দুল মতীন (১৯৫৪-১৬ই জানুয়ারী ২০১০ খৃঃ) চলে গেছেন না ফেরার জগতে (আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নছীব করুন!)। আব্দুল্লাহ মাদানী আজও নেপালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দাঈ হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের কবুল করুন- আমীন! আব্দুল্লাহ মাদানী 'নূরে তাওহীদ' নামে ১৯৮৮ সাল থেকে একটা মাসিক পত্রিকা চালান। যা নেপালের প্রথম ও সেসময় ছিল একমাত্র আহলেহাদীছ পত্রিকা। তার পরে জামে'আ সিরাজুল উলুম থেকে আস-সিরাজ নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকা চলছে গত ১৯৯৪ সাল থেকে।

তাউলিয়া : পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারী'৮৯ইং তারিখে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নতুন আরেকটি কেন্দ্র তাউলিয়া মাদরাসার গেলাম। সঙ্গে মাওলানা ঝাণ্ডানগরীর ভাই মাওলানা আব্দুর রহমান নদভী (৬০), আব্দুল্লাহ মাদানীর চাচা মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব রিয়াযী (৫৫), মাওলানা হাকীকুল্লাহ ফায়যী (৫০)। ১৯৮৮ সাল থেকে আব্দুল্লাহ মাদানী তাউলিয়ার আল-মা'হাদ আল-ইসলামীতে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। সেখানে যাওয়ার সময় এক মজার ঘটনা ঘটল। বঢ়নী রেল স্টেশন থেকে উঠে ২৫ কিলোমিটার দূরে তাউলিয়া রেলস্টেশনে নেমে ২০ কিলোমিটার দূরে তাউলিয়া মাদরাসায় যাওয়ার পথে গাড়ীতে চেকিং। আমার ব্যাগে চাউলের কৌটা দেখে ওরা সন্দেহ করল। আমি দৈনিক সকালে খালি পেটে চাউল-পানি খাওয়ায় অভ্যস্ত। কিন্তু ওদের বুঝাবে কে? মূর্খ পুলিশগুলো কোন বুঝ মানল না। শেষে পুলিশের গাড়ীতে করে সোজা তাউলিয়া সিডিওর পুলিশ হেড কোয়ার্টার। মাওলানা হারূণ তাউলিয়ার প্রভাবশালী আহলেহাদীছ আলেম। উনি আগেই সেখানে চলে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে আমাকে সেখানে পৌঁছে আর কারো মুখোমুখি হ'তে হয়নি। পুলিশের গাড়ী থেকে নেমে আলেমগণের সাথে সোজা তাউলিয়া মাদরাসায় পৌঁছি। সেখানে গিয়ে যোহরের ছালাতের পর ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা করি উর্দূতে। আজব ব্যাপার এই যে, উনারা নেপালী হলেও সবাই উর্দূভাষী। কেউ নেপালী ভাষা বলেন না। আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে সবাই খুব খুশী হলেন। আর আমি সবচেয়ে খুশী হলাম নেপালের শ্রেষ্ঠতম আলেম অশীতিপর বৃদ্ধ মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী (১৯০৬-৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৯ খৃঃ)-কে পেয়ে। ওনার সঙ্গে ইতিপূর্বে দিল্লী ফতেহপুর সিক্রী জামে মসজিদের মেহমানখানায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু উনি তখন বের হচ্ছিলেন বলে তেমন কথা বলার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া যুবসংঘের জাতীয় সম্মেলনে তাঁকে দাওয়াতনামা পাঠানোর কারণে তিনি আমাকে নামে চিনতেন। যদিও তখন জাতীয় সম্মেলন হয়নি। এখানে তাঁকে সহ অন্যান্য আলেমদের পেয়ে আমার নেপাল ভ্রমণ সার্থক হ'ল। তাঁদের সকলের কাছ থেকে সাধ্যমত তথ্যাদি নিলাম।

পরদিন ৯ই ফেব্রুয়ারী সকালে তাউলিয়া থেকে কৃষ্ণনগর যাব। লোকাল বাস ধরতে হবে। দীর্ঘ বিরতিতে চলে। ফলে একটা ধরতে না পারলে পরেরটার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাতে কৃষ্ণনগর গিয়ে নাইট কোচের টিকিট পাওয়া যাবে না। এদিকে বাস স্টেশন পর্যন্ত দু'তিন মাইল রাস্তা। যাব কিভাবে? আব্দুল্লাহ মাদানী লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললাম, আপনাদের এখানে বাই সাইকেল পাওয়া যায় না? একটা পাওয়া গেল। দু'জন ছাত্রকে নিলাম। একজনকে সামনে রডে বসিয়ে এবং একজনকে পিছনে ক্যারিয়ারে বসিয়ে ব্যাগ নিয়ে। এরপর সীটে বসলাম। শিক্ষকরা সব থ'। সামনে পাহাড়ী ঝরণা। ওটা পার হবার কোন ব্রীজ নেই। ঝিরঝিরে পানির ধারা। নীচে নুড়ি-পাথর দেখা যাচ্ছে। ছাত্র দু'জন নামতে চাইল। আমি তাদের না নামিয়ে সোজা চালিয়ে দিলাম পানির মধ্য দিয়ে। পাহাড় ঢালু থাকায় এক টানে গিয়ে উঠলাম ওপারে। ছাত্র দু'জন তো ভয়ে দিশেহারা। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের ২২শে জানুয়ারীতে কুয়েতের হোটেল মেরিডিয়ানে সাক্ষাত হলে আব্দুল্লাহ মাদানী খুব রসিয়ে ঐ গল্প বললেন। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও আলেমদের নিকট ঘটনাটি ছিল নাকি আলোচনার বিষয়। ঐ ঝর্ণার ছবি তুললাম। পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্ণা বয়ে চলেছে ঝিরঝির ধারে মৃদু কলতানে সবুজ যমীনে প্রভাত সূর্যের রঙ মাখানো লালপেড়ে শাড়ী পরে। কি চমৎকার দৃশ্য! এ্যালবামে রাখা ছবিটি দেখে ভাবছি ছবির মত সুন্দর দেশটি আল্লাহর কি এক অপূর্ব সৃষ্টি!! সে সৌন্দর্যের আরো এক ঝলক দেখা গেল পরদিন ভোরে কাঠমণ্ডু থেকে ২০ কি.মি. দূরে থাকতে পাহাড়ের মধ্য হ'তে যখন সূর্য কেবল ঘুম থেকে মাথা উঠালো। বরফাবৃত পর্বতমালার শীর্ষে ও ঢালুতে প্রভাত সূর্যের চিকচিকে মনোরম দৃশ্য যে দেখেনি, সে যেন কিছুই দেখেনি। এই অপূর্ব সৃষ্টি যার, তিনি নিজে না জানি কত সুন্দর! ইচ্ছা জেগেছিল 'মাউন্টেন ফ্লাইটে' উঠে নেপালের পুরা পাহাড়ী এলাকার দৃশ্য ভালভাবে দেখব। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের মিল হলো না।

দেশে ফেরা : ১০ই ফেব্রুয়ারী'৮৯ দুপুরে কাঠমণ্ডু থেকে সরাসরি ফ্লাইটে ঢাকা রওয়ানা হ'লাম। ৫২ দিনের সফর শেষে দেশে ফেরার এক অদম্য অনুভূতি নিয়ে। মনে মনে হিসেব করছিলাম সার্কের ৪টি দেশের মধ্যে কোন দেশটি সবচেয়ে সুন্দর? সফরের শুরুতে ২১শে ডিসেম্বর'৮৮ বিকালে যখন করাচী এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম, তখন সেখানকার ধূসর রানওয়ে দেখে মনটা বিগড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এখানকার মানুষগুলোর অন্তরও ধূসর ও দরদহীন। পরে দিল্লী এয়ারপোর্ট। পার্থক্য তেমন কিছু বুঝিনি। কারণ লাহোর ও দিল্লীর দূরত্ব আধা ঘন্টারও কম। কলিকাতা ও বাগডোগরা এয়ারপোর্টও কেমন যেন রুক্ষ প্রকৃতির। কাঠমাণ্ডু থেকে ফেরার পথে এদিন ৩৩ হাযার ফুট উপর থেকে বেলা ৩-টার দিকে নীচে তাকিয়ে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ ও তার মাথায় জমা বরফের উত্থিত দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল হাত বাড়ালেই বরফ হাতে পাব। বরফের বুকে সূর্যের কিরণ যে কত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হতে পারে, তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা মিলিয়ে গেল। ভারতের লাল ও ধূসর মাটি পেরিয়ে বাংলাদেশের আকাশ সীমায় প্রবেশ করতেই বিমান ক্রমে নীচু হতে লাগল। আর তার সবুজ চেহারা ক্রমেই ভেসে উঠতে থাকল। এতক্ষণে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে গেল। চক্ষু জুড়িয়ে গেল। হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গেল। নদী আর সবুজে ভরা এই দেশের কোন তুলনা নেই কোথাও। আল্লাহ তুমি আমাদের দেশটিকে নিরাপদ ও শান্তির দেশে পরিণত কর-আমীন!

সন্ধ্যায় ঢাকায় নেমে পরদিন সালমান রুশদীর *'স্যাটানিক ভার্সেস'*-এর বিরুদ্ধে পত্রিকায় কড়া বিবৃতি দিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ শেষে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পরিশেষে বলব, আমার পিএইচডি গবেষণাটি ছিল আমার জীবনের স্বপ্ন পূরণের পথে একটি কঠোর সাধনা। স্টাডি ট্যুরের ৫২ দিন ছিল তারই একটা পর্ব মাত্র। সংগঠনের বরকতে ও তাওহীদের ডাক-এর আগ্রহে দীর্ঘদিন পরে সেই ফেলে আসা পর্বটি কাগজ-কলমে বেঁধে ফেলতে পারায় অনেকটা ভারমুক্ত হলাম। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীদের জন্য পাথেয় হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের সকল নিঃস্বার্থ নেক আমল কবুল করুন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল দাওয়াতকে তার নেক বান্দাদের কবুল করার তাওফীক দিন- আমীন! ***(ক্রমশঃ)***

ইসলামের পরশে ধন্য হলেন লরেন বুথ

-হাসীবুল ইসলাম

['ইংল্যাণ্ডে প্রতি বছর প্রায় ৫ সহস্রাধিক খৃষ্টান ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১০ সালে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা প্রখ্যাত সমাজকর্মী ও ফিলিস্তীন স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী লরেন বুথ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম বৃটেনের লণ্ডন শহরে ১৯৬৭ সালে। তাঁর পিতা টনি বুথ ছিলেন একজন ইহুদী এবং পেশায় টিভি অভিনেতা। সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের স্ত্রী চেরী ব্লেয়ারের বৈমাত্রেয় বোন তিনি। পেশায় সাংবাদিক। বর্তমানে লণ্ডনভিত্তিক ইরানী টিভি চ্যানেল প্রেস টিভিতে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ২ সন্তানের জননী। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে তিনি সাংবাদিক হিসাবে পশ্চিম তীর সফর করেন এবং ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এরপরও তিনি পেশাগত দায়িত্বপালনে বার বার ফিলিস্তীনে ছুটে গেছেন। ২০০৮ সালে ফিলিস্তীনী প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়া তাঁকে বিশেষ সম্মানসূচক ভিআইপি পাসপোর্ট প্রদান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। অতঃপর ২৩ অক্টোবর'১০ তিনি একটি সম্মেলনে হিজাব পরিধান করে উপস্থিত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণা তখন সারা বিশ্বে বেশ সাড়া ফেলে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর মুসলিম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রদান করেন।]

এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত এক সফর। যার বাহন উষ্ণতায় ভরা আর সহযাত্রীরা অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুসুলভ। কোন রকমের বিলম্ব ছাড়াই আমরা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছি। বৃষ্টি, তুষারপাত, রেলক্রসিং কোন কিছুই আমাদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারছে না। যদিও এখনও পর্যন্ত আমার কোন ধারণাই নেই যে, আমি কিভাবে এর আরোহী হলাম, না আমার কোনরূপ ধারণা আছে যে, ট্রেনের গন্তব্য কোথায়। তবে গন্তব্য যেটাই হোক না কেন সেটা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থান, তা আমি অনুমান করতে পারছি।

আমি জানি আমার এসব কথা-বার্তা আপনাদের কাছে ভীষণভাবে অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু গত সপ্তাহে আমার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে আমার অনুভূতি সত্যিই এমন।

যদিও যেসব কারণ ও ঘটনাবলী আমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, তা রহস্যাবৃতই, তবে আমার এই সিদ্ধান্ত আমার ভবিষ্যত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে এমন কঠিনভাবে নির্ধারিত করবে, যেমন রেলপথ যুগল দ্রুতগামী ট্রেনের নীচে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করে।

আমি একজন ফ্রীল্যান্স ইংরেজ সাংবাদিক এবং একজন সিঙ্গেল কর্মরত মা হয়ে পশ্চিমা মিডিয়ার সবচেয়ে কম জনপ্রিয় একটা ধর্মকে কিভাবে আঁকড়ে ধরলাম–এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমার মনে হয়, মাত্র মাসাধিককাল পূর্বে আমি যে এক ইরানী মসজিদে গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, তার প্রতি ইঙ্গিত করতে হয়।

তবে বিষয়টি আরো বোধগম্য হবে যদি আমি ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে ফিরে যাই। সেসময় আমি পশ্চীম তীরে রবিবারের The Mail পত্রিকার জন্য একটি নির্বাচনের সংবাদ কাভার করতে একাকী উপস্থিত হয়েছিলাম। বলে রাখা ভাল, ঐ সফরের পূর্বে আমার কখনো কোন আরব বা কোন মুসলিমের সাথে সময় কাটানোর অভিজ্ঞতা ছিল না।

সুতরাং পুরো অভিজ্ঞতাটি ছিল আমার জন্য অপ্রত্যাশিত। তবে সেসব কারণে নয়, যা আমার ধারণা করার কথা ছিল। আসলে আমরা যতখানি জানি পৃথিবীর এই অংশের মানুষ সম্পর্কে, যারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অনুসরণ করে, তা মূলতঃ এক অস্বাভাবিক ধারণার ফসল। বরং বলা যায় পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাই আমি যখন মধ্যপ্রাচ্যের দিকে উড়াল দিলাম, তখন ভ্রমণ গাইডে মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে আমার মনে রাত ১০টার বকওয়াজ গুঞ্জনের মত অধিকতরভাবে ভন ভন করছে– চরমপন্থী মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, বাধ্যগত বিবাহ, আত্মঘাতি বোমারু, জিহাদ ইত্যাদি শব্দগুলো। যদিও আমার প্রথম অভিজ্ঞতাটি এর চেয়ে বেশি ইতিবাচক হতে পারত না।

আমি যখন ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে পৌঁছাই তখন পরনে শীতের কোটটি ছিল না। কেননা ইসরাঈলী বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ আমার সুটকেসটি তাদের হেফাযতে রেখে দিয়েছিল।

রামাল্লার কেন্দ্রস্থলের কাছে হাঁটাহাঁটির সময় আমি শীতে জবুথবু হয়ে থরথর করে কাঁপছিলাম। তখন এক বৃদ্ধা এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আরবীতে দ্রুত কিছু কথা বলে, তিনি আমাকে একটি পার্শ্বের রাস্তার ধারে একটি বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমি ভাবছিলাম, আমি কি একজন বৃদ্ধা জঙ্গীর হাতে কিডনাপ্‌ড হচ্ছি? বিব্রতকর কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেখলাম, তিনি তাঁর মেয়ের ওয়ারড্রোব থেকে একটি কোট, একটি হ্যাট এবং একটি চাদর বের করে নিয়ে আসলেন।

তারপর যেখানে আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম, সে রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে একটি চুমু দিয়ে তিনি আমাকে খুব উষ্ণতার সাথে আমার গন্তব্যের পথে ছেড়ে দিলেন। অথচ আমাদের দু'জনের মাঝে একটি বোধগম্য কথাও বিনিময় হয়নি।

এই উদারতার কথা আমি কখনোই ভুলিনি এবং এ কথা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন স্থানে আমি শতাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেছি। তথাপি আমার দেখা এই নৈতিকতার উষ্ণতা আমাদের সংবাদপত্রে যা আমরা পড়ি এবং দেখি তাতে খুব কমই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরবর্তী তিন বছর আমি অসংখ্যবার অধিকৃত ভূমিতে সফর করেছি, যা একসময় ছিল ঐতিহাসিক ফিলিস্তীন ভূমি। প্রথমে আমি কিছু কাজ হাতে নিলাম। সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি দাতব্য সংস্থাসমূহ এবং ফিলিস্তীনীদের সমর্থক দলগুলোর সাথে সফরে বের হওয়া শুরু করলাম।

সকল ধর্মের ফিলিস্তীনীদের দুর্ভোগ দেখে আমি চ্যালেঞ্জ বোধ করলাম। এটা স্মর্তব্য যে, এই পবিত্র ভূমিতে দুই হাযার বছর ধরে খৃষ্টানরাও বসবাস করছে এবং ইসরাঈলের অবৈধ দখলদারিত্বের কষ্ট তাদেরকেও ভোগ করতে হচ্ছে।

ক্রমাগতভাবে আমি 'মাশাআল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর মত কিছু অভিব্যক্তি আমার দৈনন্দিন কথার মধ্যে সঙ্গোপনে ঢুকে পড়তে দেখলাম। এগুলো মূলতঃ আল্লাহ্‌র একশটি নাম থেকে উৎসারিত প্রশংসাসূচক উচ্চারণ। মুসলিম গ্রুপগুলোর ব্যাপারে বিচলিত না হয়ে আমি বরং তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। এটা ছিল আমার জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন, সর্বোপরি দয়ার্দ্র ও উদারচিত্তের মানুষগুলোর সাথে সময় কাটানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ।

আমি কোন প্রকার সংশয় ছাড়াই বুঝতে পারছিলাম যে, আমার রাজনৈতিক বুঝের পরিবর্তনটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ফিলিস্তীনীরা 'সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী' না হয়ে পরিবারে পরিণত

হয়েছে এবং মুসলিম শহরগুলো 'ধারাবাহিক ধ্বংস'-এর মুখে পতিত হওয়া শহরের পরিবর্তে একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু ধর্মের পথে যাত্রা? না, এটি আমার ক্ষেত্রে কখনোই ঘটার কথা ছিল না। যদিও সর্বদাই আমি প্রার্থনা করতে পসন্দ করতাম এবং শিশুকাল থেকেই আমি স্কুলে এবং ব্রাউনিতে ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য প্রচীন নবীদের কাহিনী সম্পর্কে পাওয়া বইগুলো খুব উপভোগ করতাম। যদিওবা একটি ধর্মনিরেপেক্ষ পরিবেশে আমি বড় হয়েছি।

তারপরও ধর্মের দিকে আমি যাত্রা করলাম। সম্ভবত মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের প্রতি মুগ্ধতা আমাকে প্রথম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

ইংরেজদের চোখে মুসলিম মহিলাদের কেমন অদ্ভুত মনে হবে, যাদের পা হতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর আবৃত, যারা মাঝে মাঝে তাদের স্বামীদের পিছনে চারপাশে সন্তানদের নিয়ে হেঁটে চলে (যদিও তা সার্বজনীন ঘটনা নয়)।

অন্যদিকে ইউরোপের পেশাজীবী মহিলাগণ তাদের শরীর দেখাতে পারলেই অধিক আনন্দিত বোধ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, আমি নিজেই আমার আকর্ষণীয় স্বর্ণালী কেশ এবং আমার বুকের প্রশস্ত স্থানটির জন্য সর্বদাই গর্ববোধ করেছি। সবসময়ই এগুলো প্রদর্শন করাটা ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ বর্তমানে আমরা যা মার্কেটে কেনাকাটা করি, তার অনেক কিছুতেই রয়েছে আমাদের নারীদের শরীরের ব্যবহার।

সেইসাথে যখনই আমি টেলিভিশনে আমন্ত্রিত হয়েছি, আমি বসে বসে বিস্ময়ের সাথে দেখেছি যে, মহিলা উপস্থাপিকাগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ১৫ মিনিটেরও কম সময় অতিবাহিত করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে কেবল মেকআপ ও চুলের সজ্জাতেই ব্যয় করেন এক ঘন্টা!! এটা কি স্বাধীনতা? আমি বিস্মিত হতে লাগলাম যে, আমাদের 'মুক্ত' সমাজে বালিকা এবং মহিলাগণ আসলে কতটা সম্মান পেয়ে থাকেন!!

২০০৭ সালে আমি লেবাননে গিয়েছিলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে চারদিন কাটালাম। যাদের প্রত্যেকেই ছিল পূর্ণ হিজাব পরিহিতা। পাজামা অথবা জিন্সের প্যান্টের উপরে বেল্ট বাধা জামা পরিহিতা, যাতে কোন চুলের প্রদর্শনী ছিল না। তারা ছিল আকর্ষণীয়া, স্বাধীন এবং স্পষ্টবাদী। তারা মোটেই ভীরু প্রকৃতির ছিল না বা এমন ছিল না যে, তারা শীঘ্রই বিবাহ করতে বাধ্য হবে–যা কিনা আমি প্রায়ই পশ্চিমা পত্রিকায় পড়ে কল্পনা করতাম।

এক পর্যায়ে একজন শায়খের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় তারা আমার সঙ্গী হল, যিনি হিজবুল্লাহ মিলিশিয়াদের একজন কমাণ্ডারও ছিলেন। মেয়েদের প্রতি তাঁর আচরণে আমি আনন্দের সাথে বিস্মিত হলাম। বাদামী প্রলম্বিত জুব্বা ও পাগড়ী পরিহিত শায়খ নাবীল যখন বন্দী বিনিময় নিয়ে কিছু কথা গোপনভাবে বলতে চাইলেন, তখন তারা তাঁর আলোচনায় অনাহুতভাবে শরীক হল। তারা তাঁর কথার উপর কথা বলতে কিংবা তাঁর কথা আমাকে ইংরেজী অনুবাদ করে শোনানোর জন্য হাত উঁচু করে তাঁকে থামিয়ে দিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করছিল না। আসলে মুসলিম মহিলাদের দাদাগিরিটা বেশ কৌতুককর, যা তাদের সম্প্রদায়ের বহু বাড়িতেই সত্য। তোমরা কি পুরুষদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলীর নিচে দেখতে চাও? তাহলে অন্যদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অনেক মুসলিম স্বামীদের দিকে লক্ষ্য কর।

সত্যিই, ঠিক গতকালই বসনিয়ার প্রধান মুফতি আমাকে ফোন করলেন এবং আধা-কৌতুকের স্বরে নিজেকে 'আমার স্ত্রীর স্বামী' বলে আমার কাছে পরিচয় দিলেন।

এছাড়াও আমার মাঝে কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছিল। যতবারই আমি মধ্যপ্রাচ্যে সময় অতিবাহিত করেছি, ততবারই আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে বলেছি। মনে মনে নিজেকে বলতাম, আমি তো সেখানে কেবল ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি। কিন্তু বস্তুতঃ মসজিদগুলো আমার কাছে মনোমুগ্ধকর লাগত। কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতির কারবার নেই। গীর্জার হেলান দেয়া বেঞ্চের পরিবর্তে সেখানে রয়েছে মাটিতে বিছানো গালিচা। এই মসজিদগুলো ছিল আমার চোখে একটি বিশাল বসার ঘর, যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে, মহিলারা তাদের পরিবারকে পিঠা এবং দুধ খাওয়ায় এবং নানী-দাদীরা হুইল চেয়ারে বসে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তারা তাদের জীবনকে নিয়ে যায় যেমন তাদের উপাসনালয়ে। তেমনি সেখান থেকে উপাসনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নিজ নিজ গৃহে।

তারপর এল সেই রাত, ইরানের কোম শহরে ফাতেমা মাসুমার সমাধির সোনালী গম্বুজের নীচে। অন্য তীর্থযাত্রী মহিলাদের মতো আমিও ফাতেমার সমাধির খিল ধরে থেকে কয়েকবার আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলাম। যখন আমি বসলাম, তখন স্রেফ এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক আনন্দ আমার ভিতরে আন্দোলিত হতে লাগল। এ এমন এক আনন্দ যা তোমাকে মাটি হতে উপরে লাফিয়ে তুলবে না; বরং তোমাকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেবে। আমি দীর্ঘক্ষণ বসে ছিলাম। তরুণীরা আমার চারপাশে জড়ো হল। আর বলতে লাগল–তোমার মধ্যে তো দারুণ কিছু ঘটেছে মনে হয়। তখন আমি জানলাম যে, আমি আর ইসলামের পথে কেবল একজন সৌখিন পর্যটক নই বরং সেই মুসলিম উম্মাহ এবং সেই ইসলামী সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী পরিব্রাজক, যা কি না সকল বিশ্বাসীকে একতার সূত্রে সংযুক্ত করে দেয়।

প্রথম প্রথম ইসলামে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসার একটা অনুভূতি আমার ভিতরে বিরাজ করছিল কয়েকটি কারণে। আমার মনে হচ্ছিল, আমি কি পরিবর্তিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত? আমার পরিবার আর বন্ধুরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে? আমি কি ব্যাপকভাবে আমার আচরণকে সংযত করতে তৈরী?

তবে বাস্তবতা সত্যিই খুব অদ্ভুত। মূলতঃ এসব বিষয় নিয়ে আমার চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কেননা যেভাবেই হোক মুসলিম হওয়াটা সত্যিই খুব সহজ ব্যাপার। যদিও বা প্রাক্টিসিং মুসলিম হওয়া অবশ্যই অন্যরকম কঠিন।

প্রাথমিকভাবে ইসলাম পর্যাপ্ত পড়াশুনা দাবি করে। তাছাড়া আমি দু'টি সন্তানের মা এবং ফুলটাইম কাজ করি। একজন মুসলিম হিসাবে কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলাই তোমার কাছে প্রত্যাশিত। সেই সাথে ইমামদের চিন্তা-গবেষণা এবং আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত মানুষদের আচার-আচরণ সম্পর্কেও জানতে হয়। অধিকাংশ মানুষকে তাদের ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে যদি বছরাধিককাল নাও হয় তবুও কমপক্ষে কয়েকটি মাস অধ্যয়নে অতিবাহিত করতে হয়।

লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কুরআনের কতটুকু পড়েছি। আমার উত্তর, আমি এখন পর্যন্ত কেবল ১০০ পৃষ্ঠার মত পড়েছি অনুবাদসহ। তবে আমাকে তাচ্ছিল্য করার পূর্বে কোন ব্যক্তির জানতে হবে, একবারে মোট ১০টি আয়াতই পড়া উচিৎ; এর বেশী নয়। আর সাথে সাথে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে পড়তে হয়, অনুধাবন করতে হয়, আর যদি সম্ভব হয় তবে মুখস্তও করতে হয়। সুতরাং বিষয়টি মোটেও OK ম্যাগাজিনের মত হালকা নয়।

এই কুরআন একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা আমি আমার জীবন পরিচালনার জন্য জানতে চলেছি। এটা আমাকে আরবী শিখতে সাহায্য করবে। আর আমি এটাই চাই, যদিও তা সময় সাপেক্ষ। উত্তর লণ্ডনের কয়েকটি মসজিদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে এবং সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন সেখানে নিয়মিতভাবে যাওয়ার আশা করছি। যাইহোক আমি কখনই বলব না যে, আমি সুন্নী না কি শী'আ মতদর্শী। বরং আমার জন্য ইসলাম একটাই আর আল্লাহ একজনই।

শালীন পোশাক ব্যবহার করাকে তোমরা যেমন দেখ, তার চেয়ে অনেক কম ঝামেলার। মাথায় ওড়না পরার অর্থ আমি আগের চেয়ে দ্রুত বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ঠিক এক সপ্তাহ আগে যখন আমি প্রথমবার এটা আমার চুলের উপর ঢিলেঢালাভাবে পরেছিলাম তখন লজ্জা পাচ্ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে বাইরে ঠাণ্ডা থাকায় সামান্য কয়েকজন লোকেই আমার দিকে মনোযোগ দিতে পেরেছিল। তবে সূর্যালোকে বের হওয়া ছিল আরো বেশী চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। কিন্তু এদেশ একটি সহনশীল দেশ এবং বাইরে কেউই এ পর্যন্ত আমার দিকে আড় চোখে তাকায়নি।

নেকাব বা বোরকার মত কঠোর পর্দা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও যেসব মহিলা সংযমের এই সর্বোচ্চ পর্যায়টা বেছে নিয়েছেন আমি তাদের সমালোচনা করছি না। কিন্তু ইসলামে এই বাধ্যবাধকতা নেই যে, আমাকে এত কঠোর পোষাক বেছে নিতে হবে (প্রাথমিক পর্যায়ে এ মন্তব্য করলেও বর্তমানে তিনি বোরকা ও হিজাব পরিধান করেন)।

পূর্বানুমিতভাবে গণমাধ্যমের কিছু অংশে আমার ধর্মান্তর নিয়ে অবারিতভাবে গালিগালাজ করা হয়, যার লক্ষ্যবস্তু মূলতঃ আমি ছিলাম না বরং তা ছিল ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা। তবে আমি তাদের সেসব নেতিবাচক মন্তব্যসমূহকে পাত্তা দেইনি। কেননা কিছু লোক আছে যারা আধ্যাত্মিকতার মূল্য বোঝেনা এবং এ সম্পর্কে কোন আলোচনা শুনলে ভীতু হয়ে পড়ে। এটা তাদেরকে জীবনের অর্থ সম্পর্কে বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন করে। আর তাই তারা এভাবে তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করে।

আমার আর একটা চিন্তার বিষয় হ'ল পেশাগত। বিশেষ করে আমি যদি মাথায় স্কার্ফ পরি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। আসলে অন্যান্য ধর্মান্তরিত মহিলাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমি ভাবছি আমার সাথেও ঐ রকম ব্যবহার করা হবে কি-না। কেননা তাদের মতে, আমি তো আমার মনটাই হারিয়ে ফেলেছি।

সারা জীবন আমি রাজনীতিক ছিলাম এবং আগামীতেও থাকব। আমি অনেক বছর ধরে ফিলিস্তীনীদের পক্ষে কাজ করে আসছি এবং এখান থেকে আমার থেমে যাওয়ারও কোন ইচ্ছা নেই। তবে এটা ঠিক যে, ফ্রান্স বা জার্মানীর তুলনায় বৃটেন এ ব্যাপারে অনেক বেশি সহিষ্ণু। আমি ভালভাবেই জানি যে, অনেক মুসলিম মহিলাই আছেন, যারা টেলিভিশন ও গণমাধ্যমে অনেক সফলতা পেয়েছেন এবং তারা বাহ্যত পশ্চিমা পোষাক পরলেও তা সংযতভাবে পরিধান করেন। এটা কেবলই আমার নিজের জন্য একটি ইচ্ছা। যদিও আমি ইসলামে একেবারেই নতুন। আমি এখনও মৌলিক আক্বীদা ও মতবাদগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করছি। তাই আমার সাথে ইসলামের সম্পর্কটা ভিন্ন ধরণের। আমি এ কথা বলার অবস্থানে নেই যে, নবপ্রাপ্ত এই বিশ্বাসের কিছু কিছু আমার জন্য উপযোগী হয়েছে। আর কিছু কিছু আমি উপেক্ষা করব।

আমার ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে এখনও অনেক অনিশ্চয়তা আছে। আমি অনুভব করি প্রতিদিন আমার মধ্যে পরিবর্তন আসছে যে, আমি একজন ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছি। আমি ভাবি কোথায় এর শেষটা দাঁড়াবে? আমি কে হব?

আমি ভাগ্যবতী যে, আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলো এখনও অটুট রয়েছে। আমার প্রতি আমার অমুসলিম বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া যতটা না বৈরী, তার চেয়ে বেশি কৌতুহলী। তারা জিজ্ঞেস করে ইসলামগ্রহণ কি তোমাকে পরিবর্তন করে ফেলবে? এরপরও কি আমরা তোমার বন্ধু থাকতে পারব? আমরা কি ড্রিংক করতে বাইরে যেতে পারব?

প্রথম দু'টি প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক। কিন্তু শেষেরটা বড় আনন্দের সাথে নেতিবাচক। আর মায়ের ব্যাপারে আমি মনে করি, আমি সুখী হলেই আমার মা সুখী হবেন। আর আমার বাবার মাদকাসক্তির পটভূমি উঠে আসার পরও যদি আমি মাদক এড়িয়ে চলতে পারি, তাহলে কোনটি ভাল হবে?

উগ্র বাবার মাদকাসক্ত সংসারে বেড়ে উঠা আমার জীবনে একটা বড় ফাঁক রেখে গেছে। এটা এমন এক ক্ষত যা কোনদিন নিরাময় হবার নয়। আমার ব্যাপারে তার মন্তব্যগুলো খুবই আঘাতপূর্ণ। বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা একে অপরকে দেখিনি, তাহলে কিভাবে তিনি আমার সম্পর্কে কিছু জানবেন? আর কিভাবে আমার ধর্মান্তর হওয়ার ব্যাপারে সঠিক ধারণা পাবেন? আমি তাই তার জন্য কেবল দুঃখ বোধ করছি। এছাড়া আমার পরিবারের বাকী সদস্যরা আমাকে খুব সমর্থন করেছে। আমার মা এবং আমার মাঝে একটি কঠিন সম্পর্ক ছিল যখন আমি বড় হচ্ছিলাম। তবে আমরা সম্পর্কটা আবার জোড়া লাগিয়েছি এবং তিনি আমার প্রতি ও তাঁর মেয়েদের প্রতি এখন খুব সহানুভূতিশীল। যখন আমি তাকে বললাম আমি ধর্মান্তরিত হয়েছি। তিনি বললেন, 'যাক, ঐসব পাগলদের মত তো নয়. আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলেছিলে!' তবে তিনি এখন আমার বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবং মেনে নিয়েছেন।

আর যথারীতি এ্যালকোহল পরিত্যাগ করা ছিল একটা সহজ কাজ। বস্তুতঃ আবার কখনোও এটার স্বাদ নেওয়ার কথা আমি আর ভাবতেই পারি না। আমি একেবারেই চাইনা।

আর পুরুষদের সাথে সম্পর্কের কথা ভাবার সময় আমার এখন নয়। কেননা আমি বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদ থেকে সামলে উঠছি। তাই আমি এ নিয়ে ভাবছি না এবং বিয়ে করার জন্য কোন চাপেও নেই। যদি পুনরায় বিয়ের কথা ভাবার সময় আসে, তবে তখন আমার লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী স্বামীকে মুসলিম হতে হবে।

আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমার মেয়েরা কি মুসলিম হবে? আমি জানি না, সেটা তাদের ব্যাপার। তুমি কারো অন্তরকে পরিবর্তন করতে পার না। তবে অবশ্যই তারা বৈরীভাবাপন্ন নয় এবং আমার বিস্ময়কর ধর্মান্তরে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয়।

আমি সেদিন রান্নাঘরে বসে ছিলাম। তাদেরকে ভিতরে ডাকলাম। বললাম, 'মেয়েরা, তোমাদের জন্য কিছু সংবাদ আছে'। আমি শুরু করলাম, 'আমি এখন মুসলিম'। বড় মেয়ে এলেক্সের সাথে একসাথে জড়ো দু'জন বলল, 'আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে, আমরা এখনই ফিরে আসছি'।

তারা একটি তালিকা করে ফিরে আসল। এলেক্স একটু কেশে বলল, 'তুমি কি আর এ্যালকোহল সেবন করবে'? আমি বললাম, 'না'। সে উদ্বেগের সাথে বলল, 'তাই?'

'তুমি কি আর সিগারেট খাবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'না'। এতেও তাদের নীতিবাগীশ অনুমোদন মিলল।

তবে তাদের শেষের প্রশ্নটা আমাকে বিব্রত করে ফেলল। তারা বলল, 'তুমি একজন মুসলিম, তুমি কি তোমার বক্ষদেশকে মানুষের সামনে উন্মুক্ত রাখবে?

কী! মনে হয় তারা আমার ভিতরের এবং উপরের জামায় বিব্রত হয়েছে এবং তাদের স্কুলে যাওয়া-আসার সময় আমার অনাকর্ষনীয় বক্ষ নিয়ে লজ্জাবোধ করে। পশ্চাদদৃষ্টিতে সম্ভবত আমারও লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল।

যাহোক আমি বললাম, 'আমি এখন মুসলিম, 'আমি আর কখনোও আমার বক্ষদেশ মানুষের সামনে প্রদর্শন করব না'।

'আমরা ইসলামকে ভালবাসি'–তারা উল্লোসিত হয়ে চিৎকার দিল এবং খেলতে চলে গেল। আর আমিও ইসলাম ভালবাসি।

[লেখক : কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

পরকাল কেন থাকতেই হবে?

তানভীর আহমাদ আরজেল

মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন

আচ্ছা এই দুনিয়ার জীবনটাই কি একমাত্র জীবন, না এর পরেও কোন জীবন আছে? অর্থাৎ মরণের সাথে সাথেই কি এই মানব জীবনের পরিসমাপ্তি, না তার পরও জীবনের জের টানা হবে? মানব মনের এ এক স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং সকল যুগেই এ প্রশ্নে দ্বিমত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে দুই বিপরীতমুখী সমাজ ব্যবস্থা।

মানুষ ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুকাল এই দুনিয়ায় অবস্থান করে এবং তারপর বিদায় গ্রহণ করে। এ এক চিরন্তন রীতি। এতে কোন পরিবর্তন নাই। তবে এ অবস্থান কারো জন্যে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কারো বা কয়েকদিন, কারো বা কয়েক মাস, কারো বা কয়েক বছর। আবার কেউ শতাধিক বছরও বেঁচে থাকে। কেউ আবার অতি বার্ধ্যক্যে শিশুর চেয়েও অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করে। বেঁচে থাকাকালীন মানুষের জীবনে থাকে কত আশা-আকাংখা, কত রঙ্গিন স্বপ্ন। কারো জীবন ভরে উঠে অফুরন্ত সুখ-সাচ্ছন্দ্যে, লাভ করে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করার সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ। ধন-দৌলত, মান-সম্মান, যশ ও গৌরব–আরও কত কি? অবশেষে একদিন সব কিছু ফেলে, সকলকে কাঁদিয়ে তাকে চলে যেতে হয় এই দুনিয়া ছেড়ে। তার ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বাদশাহী, পরিষদবৃন্দ, উজির নাজির, বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীবৃন্দ, অঢেল ধন সম্পদ কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। অতীতেও কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও কেউ পারবেনা। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, সাদা-কালো সবাইকেই স্বাদ গ্রহণ করতে হয় মরণের।

কারো কারো জীবনে নেমে আসে একটানা দুঃখ-দৈন্য। অপরের অবহেলা, অত্যাচার-উৎপীড়ন, অবিচার-নিষ্পেষণ। সারা জীবনভর তাকে সবকিছুতেই মুখ বুজে নীরবে সয়ে যেতে হয়। অবশেষে সমাজের এই নির্মম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেও একদিন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আবার এমনটিও দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি অতিশয় সৎ জীবনযাপন করছে। পরস্বার্থহরণ, পরনিন্দা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বিপন্নের সাহায্য, ভালো কথা, ভালো কাজ ও ভালো চিন্তা তার গুণাবলীর অন্যতম। কিন্তু সে তার জাতির কাছ থেকে পেল চরম অনাদর, অত্যাচার ও অবিচার। অবশেষে নির্মম নির্যাতনের মধ্যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অথবা ফাঁসীর মঞ্চে তার জীবনলীলার অবসান হয়। এ জীবনে সে তার সত্য ও সুন্দরের কোন পুরষ্কারই পেল না। তাহলে কি তার মানবতা শুধু আর্তনাদ করেই ব্যর্থ হবে? আবার এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় ভুরি ভুরি যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সত্যের আওয়াজ তুলতে গিয়ে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করতে গিয়ে অসত্যের পূজারী, জালেম শক্তিধরকে করেছে ক্ষিপ্ত, জালেমদের ক্ষমতার মসনদকে করেছে কম্পিত ও টলটলায়মান। অতঃপর জালেম তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে সত্যের পতাকাবাহীকে করেছে বন্দী। বন্দীশালায় তার উপর চালিয়েছে নির্মম নির্যাতনের ষ্টীমরোলার, আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করেছে তার দেহ। তা সত্ত্বেও তাকে বিচলিত করা যায়নি সত্যের পথ থেকে। তার অত্যাচার নির্যাতনের কথা যার কানেই গেছে তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে। হয়তো সমবেদনায় দু ফোঁটা চোখের পানিও গড়িয়ে পড়েছে।

যারা ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পূজারী তারা কি চায় না যে, নির্যাতিত ব্যক্তি পুরস্কৃত হোক এবং জালেম স্বৈরাচারীর শাস্তি হোক? কিন্তু কখন এবং কিভাবে?

আবার এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে অসংখ্য যে, এক ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে সুখে জীবনযাপন করছে। সে কারো সাথে অন্যায় করেনি কোনদিন। হঠাৎ একদিন একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তার বাড়ী চড়াও করল অন্যায়ভাবে। গৃহস্বামী ও তার পুত্রদেরকে হত্যা করলো, নারীদের উপর চালালো পাশবিক অত্যাচার। গৃহের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করলো। অবশিষ্টের উপর করলো অগ্নিসংযোগ। ঘটনাটি যেই শুনলো সেই বড় আক্ষেপ করলো। সকলের মুখে একই কথা, আহ! এমন নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ? এর কি কোন বিচার নেই?

হয়তো তার বিচারের কোন সম্ভাবনাও নেই। কারণ বিচারের ভার যাদের হাতে, তাদের হয়তো সংযোগ সহযোগিতা রয়েছে এইসব নরপিশাচদের সাথে। তাহলে কি মানব সন্তানের উপর এমনি অবিচার অত্যাচার চলতেই থাকবে? বিচার পাবার আগেই তো উক্ত নির্যাতিত মানব সন্তানগুলো এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। এখন তারা কোথায়? নির্যাতিত আত্মাগুলো কি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে? নিঃশেষ হয়ে গেছে, নাকি এখনো তারা আর্তনাদ করেই ফিরছে? তাদের মৃত্যুর পরের অধ্যায়টা কেমন? পরিপূর্ণ শূন্যতা নাকি অন্যকিছু? আর জালেম নরপিশাচ যারা, যাদের কোন বিচার হলো না এই দুনিয়ায়, তারারও তো একদিন মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যুর পরে কি তাদের কিছুই হবে না? তাদের এত বড় অন্যায়ের শাস্তির কোন ব্যবস্থা কি থাকবেনা?

আবার দেখুন, এ দুনিয়ার বুকে কাউকে তার অপরাধের শাস্তি এবং মহৎ কাজের পুরষ্কার দিতে চাইলেই কি তা ঠিকমতো দেয়া যায় বা সম্ভব?

মনে করুন এক ব্যক্তি শতাধিক মানব সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার অত্যাচারে শত শত পরিবার ধ্বংস হয়েছে। অবশেষে একদিন তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করানো হলো। এখানে পৌঁছে সে আইনের চোরা পথে অথবা অন্য কোন অসৎ পন্থায় বেঁচেও যেতে পারে। যদি তার বাঁচার কোন পথই খোলা না থাকে তাহলে আপনি থাকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু কি শাস্তি? সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। প্রকৃত খুনীর মৃত্যুদণ্ড কিন্তু অনেক সময় মওকুফও হয়ে যায়। সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি উক্ত খুনীকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে মুক্তও করে দিতে পারে। আর যদি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরই হয়, তাহলে শতাধিক ব্যক্তি হত্যার দায়ে কি একটিমাত্র মৃত্যুদণ্ড? এ দণ্ড কি তার জন্যে যথেষ্ট হবে? কিন্তু এর বেশী কিছু করার শক্তিও যে আপনার নেই।

অপরদিকে একব্যক্তি তার সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনায়, অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ-তিতীক্ষায় একটা গোটা জাতিকে মানুষের গোলামীর নাগ-পাশ থেকে মুক্তও করে এক সর্বশক্তিমান সত্তার সুবিচারপূর্ণ আইনের অধীন করে দিল। তাদের জন্যে একটা সুন্দর ও সুখকর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দিল। তারা হলো সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হল সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমন মহান ব্যক্তিকে কি যথাযোগ্য পুরষ্কারে পুরস্কৃত করা যায়?

উপরোক্ত ব্যক্তিদের জীবনের জের যদি মৃত্যুর পরে টানা হয় এবং কোন এক সর্বশক্তিমান সত্তা যদি তাদের উভয় শ্রেণীকে যথাযোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত ও পুরষ্কারে পুরস্কৃত করেন–যাদের যেমনটি প্রাপ্য– তাহলে কি সেটা সত্যিকার ন্যায় বিচার হয়না? তাহলে বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, মৃত্যুর পরের জীবনটাও কি অপরিহার্য নয়? এটাই সেই স্বাভাবিক প্রশ্ন যা আবহমানকাল থেকে মানব মনকে বিব্রত ও বিচলিত করে এসেছে। এর সঠিক জবাব মানুষ চিন্তা-গবেষণা করে খুঁজে

পায়না, পেতে পারে না। এর সঠিক জবাব পেতে হবে এক সর্বজ্ঞ ও নির্ভুল সত্তার কাছ থেকে।

কি সেই নির্ভুল জ্ঞান যেখান থেকে পাওয়া যাবে মানব মনের এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর?

যেকোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে একমাত্র যে জিনিসটার দরকার তা হল জ্ঞান। জ্ঞান ব্যতিরিকে কেউ কখনো কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না বা পেতে পারে না। জ্ঞানের উৎস প্রধানত দুইভাবে বিভক্ত–

ক) পঞ্চেন্দ্রিয়---ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

খ) অহী---আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী ও রাসুলগণ কর্তৃক প্রাপ্ত নির্ভুল অভ্রান্ত জ্ঞান। যদিও যুগে যুগে কিছু মানুষ এই জ্ঞানকে অস্বীকার করতে চেয়েছে এবং এখনো করছে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও জ্ঞান লাভ করতে পারেন তবে তার মুলেও রয়েছে ইন্দিয়নিচয়। সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায়। কিন্তু সে জ্ঞানও সাক্ষ্যদাতার ইন্দ্রিয়লব্ধ। তেমনি ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাও ইতিহাসলেখকের চোখে দেখা অথবা কানে শোনা জ্ঞান। তার অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞানও সবসময় নির্ভুল হয়না। সত্যর বিপরীত সাক্ষ্যও দেয়া হয়ে থাকে এবং সত্যকে বিকৃত করেও ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে। তথাপি সত্য-মিথ্যা জ্ঞানের উৎসই এগুলোকে বলতে হবে।

এখন পরকাল সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্থাৎ পরকাল আছে বলে যে জ্ঞান অথবা পরকাল নেই বলে যে জ্ঞান, তার কোনটাই ইন্দ্রিয়লব্ধ হতে পারেনা। কারণ মৃত্যু যবনিকার ওপারে গিয়ে দেখে আসার সুযোগ কারো হয়নি অথবা মৃত আত্মার সাথে সংযোগ রক্ষা করারও কোন উপায় নেই, যার ফলে কেউ একথা বলতে পারে না যে, পরকাল আছে কি নেই।

কেউ কেউ বিজ্ঞানীর মতো ভান করে বলেন যে, পরকাল আছে তা যখন কেউ দেখেনি, তখন কিছুতেই তা বিশাস করা যায়না। কিন্তু তার এ উক্তি মোটেই বিজ্ঞানসুলভ ও বিজ্ঞোচিত নয়। কারণ কেউ যখন মৃত্যুর পরপারে গিয়ে সেখানকার অবস্থাটা দেখে আসেনি তখন কি করে বলা যায় যে পরকাল নেই?

একটি বাক্সের ভিতর কি আছে কি নেই, তা আপনি বাক্সটি খুলে দেখেই বলতে পারেন। কিন্তু বাক্সটি না খুলেই কি করে আপনি বলতে পারেন যে, বাক্সটিতে কিছু নেই, আপনি শুধু এতটুকু বলতে পারেন, বাক্সটিতে কিছু আছে কি নেই তা আমার জানা নেই।

একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী তার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা কোন কিছুর সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন (তবে অনেক সময় তা ভুলও হতে পারে)। কিন্তু তার সে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে হাঁ বা না কিছুই বলতে পারেন না। তাঁকে এ কথা বলতেই হয়–এ সম্পর্কে আমার কোন কিছু জানা নেই। অতএব সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের উক্তি হবে- পরকাল আছে কি নেই-তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অতএব আছে বললে যেমন ভুল হবে, ঠিক তেমনি নেই বললেও ভুল হবে।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল জ্ঞানের প্রথম উৎস পঞ্চইন্দ্রিয় পরকাল সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই দিতে পারলো না। এখন রইল দ্বিতীয় সূত্র অহী। দেখা যাক অহী আমাদের কি জ্ঞান দান করে।

অহী--আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নবী ও রসূলগণ কর্তৃক প্রাপ্ত নির্ভুল অভ্রান্ত জ্ঞান

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, এমনকি ভূগর্ভে ও সমুদ্রগর্ভে যা কিছু আছে, সবেরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা। মানুষ সৃষ্টি করার পর তাদের সঠিক জীবনবিধান সম্পর্কে তাদেরকে জানাবার জন্যে তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। বলা বাহুল্য নবী ও রসূলগণ আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তবে আল্লাহ্ তাআলা সমাজের উৎকৃষ্ট মানুষদেরকেই নবী ও রাসূল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। নবী ও রাসূলদের কাছে আল্লাহ্ তায়ালা যে জ্ঞান প্রেরণ করেছেন তাঁকে বলা হয় অহীর জ্ঞান। এ জ্ঞান নবী ও রাসূলগণ সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে লাভ করতেন, অথবা ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে অথবা স্বপ্নযোগে লাভ করতেন। এ জ্ঞান যেহেতু আল্লাহ্র কাছ থেকে লাভ করা, তাই তা একেবারে অভ্রান্ত ও মোক্ষম সত্য।

এ দুনিয়াতে প্রথম নবী ছিলেন আদিমানব হযরত আদম (আঃ)। সর্বশেষ নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)। তবে সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী (যাদের তিনশত তেরজন রাসূলও ছিলেন), মতান্তরে কিছু কম বা বেশী এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। কিছু সংখ্যক নবী ও রাসূলের নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। আবার অনেকের নাম উল্লেখ নেই। এ কথা পবিত্র কোরআনেই বলে দেয়া আছে।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)সহ আরও যত নবী রাসূল এই পৃথিবীতে এসেছেন তাদের প্রত্যেকেই পরকাল সম্পর্কে একই মতবাদ পেশ করেছেন। পরকাল সম্পর্কে সকল নবী ও রাসূলদের উক্তির মধ্যে সামান্যতম মতভেদ নেই। তারা সকলেই একই কথা বলেছেন। মনে রাখতে হবে যে সকল নবী ও রাসূল একই যুগের এবং একই জনপদের লোক ছিলেন না যে, তারা একটি সম্মেলন করে, বহু আলোচনার পরে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সাধারণত একজন নবী বা রাসুলের মৃত্যুর পর তার শিক্ষা ও আদর্শ মানুষ একেবারে ভুলে গিয়ে সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর আরেকজন নবী বা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ছয়শত বছর পর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত একজন নবী বা রাসূলের সাথে অন্য নবী বা রাসূলের সাক্ষাত হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন যুগের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা সকলেই একই কথা বলেছেন। তার কারণ এই যে তারা মানুষের কাছে যে বাণী বা আদর্শ প্রচার করেছেন, তা তাঁদের মনগড়া কথা ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানই তারা মানুষের কাছে পরিবেশন করেছেন। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান থেকেই তারা পরকাল সম্পর্কে অভিন্ন মতবাদ পেশ করেছেন। এ ছাড়া যে আর কোন ভাবেই তা সম্ভব নয় তা একজন পাগলেও মেনে বাধ্য হবে যদি না সে হঠকারী এবং চরম মিথ্যাবাদী না হয়।

যেকোনো প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর একটিই হয়ে থাকে

এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যা বা না দিয়ে অথবা একটি মাত্র উত্তর থাকে সেই সব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর শুধুমাত্র একটিই হয়ে থাকে। ভুল উত্তর অসংখ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কেননা যারা সঠিক উত্তর দিতে ভুল করে তাঁদের মাঝে চিন্তার কোন ঐক্য থাকে না। কোন নির্ভুল সূত্র থেকে তাঁদের চিন্তা প্রবাহিত হয় না। তাই আপনি যদি একটি ক্লাসের সকল ছাত্রদেরকে একটি অংক কষতে দেন তাহলে দেখবেন যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাঁদের সকলের উত্তর একই রকম হয়েছে। অপরদিকে যারা ভুল করেছে তাঁদের সকলের উত্তর প্রায় ভিন্ন ভিন্ন। কারণ তাঁদের উত্তর সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে হয়নি।

আর তাই একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, পরকাল আছে নাকি নাই, সে প্রশ্নের একমাত্র সঠিক জবাব দিয়েছেন আল্লাহ্র নবী ও রাসূলগণ। তাঁদের জবাব সঠিক এই জন্যে যে তাঁদের সকলের জবাব হুবহু একই রকম হয়েছে। বিন্দুমাত্র কোন মতভেদ ছিলনা। আর এর সঠিকতা ও সত্যতার কারণ ছিল যে, তারা যা বলেছেন তা তাঁদের মনগড়া কোন জ্ঞান ছিলনা বরং তা ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে পরকাল অবশ্যই আছে এবং তার সত্যিকার রূপ হচ্ছে নবী ও রাসূলগণ যে রূপে বর্ণনা করেছেন। তার পরেও যদি কেউ পরকালকে অস্বীকার করতে চায় তাহলে তাঁকে হঠকারী আর চরম মিথ্যাবাদী ছাড়া কিছুই বলার থাকে না।

৫. পরকালের বিরোধিতা

প্রত্যেকই যুগেই অজ্ঞ মানুষেরা পরকালের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি যে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার পুনর্জীবন লাভ করবে। কিছু কিছু মানুষের একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস থাকলেও তার গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট। তাই তারা পরকালকে বিশ্বাস করতে পারেনি। মৃত্যুর পর মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি, চর্ম, মাংস, প্রতিটি অনু-পরমাণু ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। অথবা মৃত্তিকা এ সব কিছুকেই ভক্ষণ করে। অতঃপর তা আবার কি করে পূর্বের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ ও জীবন লাভ করবে? এ ছিল তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। তার জন্যে প্রত্যেক নবী রাসূল পরকালের কথা বলে যখন মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তখন জ্ঞানহীন লোকেরা তাঁদেরকে পাগল বলে অভিহিত করেছে। তাঁদের মতবাদ শুধু তারা মানতেই অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ সে মতবাদ প্রচারের অপরাধে তাঁদেরকে নির্যাতিত, নিগৃহীত করেছে নানানভাবে।

কেন কিছু মানুষ যুগে যুগে পরকালের বিরোধিতা করেছে এবং এখনো করছে ?

পরকালের প্রতি বিশ্বাস এত মারাত্মক ছিল কেন? এ মতবাদের প্রচার বিরুদ্ধবাদীদেরকে এতটা ক্ষেপিয়ে তুলেছিল বা তুলে কেন? এ মতবাদের প্রচারের ফলে তাঁদের কোন সর্বনাশটা হয়েছিল বা হয় যার জন্যে তারা এ মতবাদকে সহ্য করতে পারেনি বা পারেনা? এর পশ্চাতে ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক কারণ। তাহলো এই যে, যারা পরকালে বিশ্বাসী তাঁদের চরিত্র, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, রুচি ও মননশীলতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয় এক ধরনের। অন্যদিকে যারা পরকালে অবিশ্বাসী তাঁদের এসব কিছুই হয় সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। এ এক পরীক্ষিত সত্য।

পরকাল বিশ্বাসীদের এমন এক মানসিকতা গড়ে উঠে যে, সে প্রতিমুহূর্তে মনে করে তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কাজের জন্যে তাঁকে মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তার প্রতিটি কথা ও কাজ নির্ভুলভাবে এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ হচ্ছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। তার কোন একটিও গোপন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার প্রতিটি মন্দ কাজের জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে, শাস্তি পেতে হবে যদি না তার প্রভু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা না করে দেন। এ হচ্ছে তার দৃঢ় বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়। তাই সে বিরত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে সকল মন্দ কাজ থেকে।

ঠিক এর বিপরীত চরিত্র হয় পরকালে অবিশ্বাসীদের। যেহেতু তাঁদের ধারণা বা বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পরে আর কোন কিছুই নেই, তাই তাঁদের কৃতকর্মের জন্যে তাঁদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। দুনিয়ার জীবনে তারা যদি চরম লাম্পট্য ও যৌন অনাচার করে, তারা যদি হয় দস্যু ও লুণ্ঠনকারী, তারা যদি মানুষকে তার ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে পশুর চেয়ে হীন জীবনযাপনে বাধ্য করে, তবুও তাঁদের কোন ভয়ের কারণ নেই। কারণ তাঁদের বিশ্বাস এসবের জন্যে তাঁদেরকে মৃত্যুর পরে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। তাঁদের মতে মৃত্যুর পরে তো আর কিছুই নেই। না নতুন জীবন, না হিসাব-নিকাশের ঝঞ্ঝাট- ঝামেলা।

তারা একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল অস্বীকার করে এক নতুন মতবাদ গড়ে তুলেছে। সেটা হল এই যে, যেহেতু সৃষ্টিজগতের কোন স্রষ্টা নেই, পরকাল বলে কিছু নেই, অতএব জীবন থাকতে এ দুনিয়াকে প্রাণভরে উপভোগ করতে হবে। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে তো সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। অতএব খাও, দাও আর জীবনকে উপভোগ কর- (Eat, Drink and Be Merry)। আরও বলে থাকে যে, দুনিয়ার জীবনটা হল একমাত্র বেঁচে থাকে সংগ্রাম- (A Struggle for existence)। যে সবল ধূর্ত ও বুদ্ধিমান বেঁচে থাকার অধিকার একমাত্র তারই আছে, মানে ডারউইনের Survival of the fittest। আর যে দুর্বল, হোক সে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই!!!

স্রষ্টা ও পরকাল স্বীকার করলেই প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগাতে হবে, স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করতে হবে এবং অন্যায় ও অসদুপায়ে জীবনকে উপভোগ করা যাবে না। উপরন্তু জীবনকে করতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল। আর তা করলে তো জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ করা যাবে না। অতএব আল্লাহ ও পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার পেছনে এই হল তাদের মনস্তাত্ত্বিক কারণ।

উপরের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা তৈরী হয় পরকালে অবিশ্বাসের দরুন। নৈতিকতা, ন্যায়, সুবিচার, দুর্বল ও উৎপীড়নের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন প্রভৃতি গুণাবলীতে তারা বিশ্বাসী নয়। নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, হত্যাকাণ্ড, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁদের কাছে কোন অপরাধ বলে স্বীকৃত নয়। যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে নারীজাতিকে ভোগলালসার সামগ্রীতে পরিণত করতে, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটি মানব সন্তান কেন একটা গোটা দেশ ও জাতিকে গোলামে পরিণত করতে অথবা ধ্বংস করতে তাদের বিবেক কোন দংশন অনুভব করে না। তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। অতীতের বহু জাতি পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করলেও পরকাল অবিশ্বাস করার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছিল নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে। তারা হয়ে পড়েছিল অত্যাচারী রক্তপিপাসু নরপিশাচ। তাই আল্লাহ্‌ তাঁদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর বুক থেকে। তবে পরবর্তীকালের এদের অনুসারীদের জন্যে রেখে দিয়েছেন শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত।

এটাই ছিল আসল কারণ যার জন্যে কোন নবী ও রাসূল পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আবেদন জানালে পরকালে অবিশ্বাসী লোকেরা তাঁকে করে অপদস্ত, প্রস্তরঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে অথবা করেছে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত। পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাঁদের জীবনধারাকে করতে চায়নি সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত, তাঁদের উগ্র ভোগবিলাসিতাকে করতে চায়নি দমিত। মানুষকে গোলাম বানিয়ে তাঁদের উপর প্রভুত্ব করার আকাংখাকে করতে চায়নি নিবৃত্ত। নবী-রাসূলদের সাথে তাঁদের বিরোধের মূল কারণ এটাই ছিল।

পরকালে অবিশ্বাস ও চরম নৈতিক অধঃপতনের কারণে অতীতে হযরত নূহ (আ)-এর জাতি, লুত (আঃ)-এর জাতি, নমরুদ, ফেরাউন, আদ ও সামুদ জাতি, তুব্বা প্রভৃতি জাতিসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মানবসমাজে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয় ঘৃণা ও অভিশাপের সাথে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতাও শুধুমাত্র ইতিহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

শেষ কথা

আশাকরি উপরের আলোচনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পরকাল থাকতেই হবে। পরকালের অস্তিত্ব সুস্থ বিবেকের দাবী। পরকালকে অস্বীকার করে কোন মানুষ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হতে পারে না, অবশ্যই বলতে হবে সে অসুস্থ বিবেক ও মন-মানসিকতার অধিকারী। এর পরেও যদি কোন মানব সন্তান পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তবে তাঁকে হঠকারী আর চরম মিথ্যাবাদী বলা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এই আলোচনা শেষ করার আগে পবিত্র কোরআনের দুটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন–

'তোমাদের সবাইকে তার দিকে ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহর তাআলার পাকাপোক্ত ওয়াদা। নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফ (ন্যায়বিচার) সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা অবিশ্বাসীদের পথ অবলম্বন করে তারা পান করবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির প্রতিফল হিসেবে' *(সূরা ইউনুস ৪)*।

মহানায়কদের স্রোত

আহসান সাদী আল-আদেল
এমবিএ, এ্যাংলিয়া রাস্কিন ইউনিভার্সিটি
চেমসফোর্ড, ইংল্যাণ্ড।

১.

'তুমিও জিতবে' আর 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ' বইগুলো যথাক্রমে শিবখেরা আর ডেল কার্নেগীর লেখা। আমাদের দেশের দিশেহারা তরুণ-যুবকের কাছে এমন পুস্তকগুলো আলাদীনের চেরাগসম। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে বিত্ত আর চিত্তের সমন্বয়ে একজন সফল মানুষ হিসেবে তৈরী করার একটা সিলেবাস মনে করা হয় এমন পুস্তকগুলোকে। এসব থেকে খুব উৎসাহ পাওয়া যায় এটা ঠিক। কিন্তু উৎসাহটা যখন আসে কেবলমাত্র পার্থিব আরাম-আয়েশ আর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্যে তখন একটু ভয় হয়। আবার এসব প্রাপ্তির প্রতি যে লোভ দেখানো হয় তা আমাদের পরকালীন জীবনের জন্যে করণীয় সম্পর্কে উদাসীন হতে বিপুলভাবে সহায়তা করে, এই বিষয়টা একদম শিউরে উঠার মতো।

আমাদেরকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয় কীভাবে একজন সফল মানুষ তার জীবনে এত এত সফলতা লাভ করেছেন। আমাদের কাছে তাই রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হন টলস্টয়, কনফুসিয়াস, রবার্ট ব্রুস, কার্লাইল, আব্রাহাম লিঙ্কন, হালের বিল গেটস, স্টিভ জবস আর জুকারবার্গরা। আমরাও বিপুল উদ্যমে এমন রোল মডেলদের অনুসরণ করতে গিয়ে ভুলে যাই মানবজন্মের উদ্দেশ্য আর পরকালের জন্যে করণীয়গুলো। আমাদের মনোযোগটা চলে যায় পার্থিব জীবনের সাফল্যের দিকে, একমুখীভাবে।

সাধারণ মানুষ মাত্রই সম্ভবত কীর্তিমানদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পছন্দ করে। যুগে যুগে অসংখ্য কীর্তিমানরা তাই আমাদের মানসপটে রোল মডেলের আসন দখল করে আছেন। আমরা আমাদের রোল মডেলদের অনুসরণ করে বড় হতে চাই, জীবন পরিচালনা করতে চাই। বর্তমান আধুনিক যুগটা তাই আমাদের শিশুকাল থেকে রোল মডেল সাপ্লাই দিয়ে আসছে। একটি শিশুর কাছে সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান আর পাপাইরা হলো রোল মডেল। 'এসব কমিক হিরোরা তাদের অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে মন্দকে ধ্বংস করে ফেলবে', 'আমাদের নিরাপত্তার জন্যে এসব সুপারহিরোরাই শেষ ভরসা', এমনকিছু ধারণা নিয়ে আধুনিক শিশুরা বড় হতে থাকে। শিশুরা তারপর শুরু করে অ্যাকশন কার্টুন দেখা এবং তার হাত ধরে প্লে-স্টেশন আর কম্পিউটারে হিংস্রতার চর্চাটা। আরেকটু বড় হবার সাথে সাথে সুপারহিরোর জায়গা দখল করে নেয় বিভিন্ন রেসলার আর হলিউডের মাসলম্যনরা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শোবিজ আর স্পোর্টস সেলিব্রিটিদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমনা আর ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষক এবং প্রগতিশীল মেধাবী বড় ভাইগুলো যারা গাজার ফিলিংস ছাড়া পড়াশোনায় মন বসাতে পারেন না, তারা চলে আসনে আমাদের রোল মডেল হিসেবে। এছাড়া পৃথিবীর তাবৎ কর্পোরেট সেলিব্রিটিরাও সেই শ্রদ্ধার আসনে ঠাঁই পান। আমরাও পৃথিবীর বুকে দৃপ্ত পায়ে টিকে থাকার জন্যে এবং আরো আধুনিক হবার আশায় পারিবারিকভাবে গড়ে ওঠা ইসলামী মূল্যবোধগুলোর কারণে লজ্জিত হতে থাকি। পরবর্তীতে এসব মূল্যবোধ সুষ্ঠুভাবে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করি। এমন একটা জীবনে মাঝে মাঝে যখন খানিকটা হতাশা আসে তখন আশ্রয় নেই আরজ আলী মাতবর, বার্ট্রান্ড রাসেল, চে গুয়েভারা, পীর-ফকির কিংবা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের। জীবনের মানে খুঁজে পাই এইসব হিরোদের ফিলোসফিতে।

আমরা আধুনিক হতে থাকি। খানিকটা ইসলামপ্রীতি আমাদের ভেতর তবু রয়েই যায় তাই নানান কিসিমের আইডলদেরকে আমরা আমাদের প্রয়োজনে আমদানী করি। কেবল জুম'আর ছালাতের মুছল্লী আর শেভ করা চকচকে মুখের অর্থনীতিবিদ রোল মডেলরা আমাদেরকে শেখান, আধুনিক যুগের ব্যাংক ইন্টারেস্ট আর ইসলামে নিষিদ্ধ সুদ এক বিষয় না। আমাদের হাসিটা একান-ওকান হয় খুশীতে, 'যাক, আমরা তাহলে সুদ খাচ্ছি না'। রোল মডেলরা ঘোষণা করেন, বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রেম করাটা ইসলামে নিষেধ নেই। আমাদের হাসি আরো লম্বা হয়। আমরা সোডিয়াম বাতির ঝাপসা আলোর নিচে ডেটিং স্পটগুলোকে প্রেমের আলোয় উজ্জল করতে থাকি। আমাদের সুপারহিরোর কাছ থেকে ঘোষণা আসে কোরআন শরীফে পর্দার আয়াত রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের জন্যে নাযিল হয়েছিল, ম্যাংগো পিপলদের জন্যে এটা আবশ্যক না। আমাদের খুশী আর ধরে না। আপুরা তাই ফতোয়া আর জিন্সকে জাতীয় পোষাক বানিয়ে নেন। জীবনে মাস্তি করার সকল উপাদানই ইসলামে হালাল। ইসলামের মডার্ণ এডিশনটা তাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বলিউডের সালমান খান পুরো পরিবার নিয়ে ঈদের নামাজ পড়েন জেনে আমরা আপ্লুত হই, বাংলার চিত্রনায়কদের উমরাহ করার খবরে আহ্লাদিত হই। ঈদকে সামনে রেখে বলিউড-ঢালিউডে 'ঈদের ছবি' ট্যাগ নিয়ে মুভি রিলিজ হয়, আমরাও 'ঈদের ছবি'কে ঈদেরই একটা অংশ হিসেবে মেনে নিই।

আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়, যেহেতু আমরা মুসলমান, মাঝে মাঝে ছালাত পড়ি আর ছালাত শেষে হাত তুলে তুমুল দোয়া করি, আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে বেহেশত দিয়ে দেবেন, তিনি তো দয়ালু। একদিকে পৃথিবীর তাবৎ সুখ এনজয় করলাম আর অন্যদিকে মৃত্যুর পরের জীবনেও (যদি থেকে থাকে) আরাম-আয়েশটা নিশ্চিত থাকলো। এভাবে কোনো একদিন এমন আধুনিক কেউ সারা জীবন অসাম্প্রদায়িক এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে মারা গেলে তার শুভাকাঙ্খীরা হুজুর ডেকে মৃতের কানের কাছে সূরা ইয়াসিন পাঠ আর কোরআন খতম করান। স্বজনেরা সাদা কাপড় আর টুপি পরে দফায় দফায় জানাজা আর কুলখানি-চেহলাম করে মৃত ব্যক্তির বেহেশত নিশ্চিত করে ফেলেন!

কী বীভৎস আমাদের ইসলাম চিন্তা!

২.

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাছে রোল মডেল হিসেবে রাসূল (ছাঃ) কে পাঠিয়েছেন যেনো আমরা তাঁর অনুসরণ করি আর পথহারা হয়ে না যাই। সম্মানিত পাঠক, আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত রাসূলকে অনুসরণ করে কীভাবে একেকজন কীর্তিমান মানুষ পার্থিব জীবন আর পরকালীন জীবনে সফল হয়েছেন তা যদি আমরা জানতাম তাহলে তথাকথিত রোল মডেলদের ধোঁকায় পড়ে আমাদের দুই জীবনকেই অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলতাম না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীরা যেভাবে তাঁকে অনুসরণ করেছেন আমাদের জন্যে সেইসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করাটা হবে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীরা হতে পারেন আমাদের কাছে একেকজন হিরো। আমাদের হাতের নাগালেই আজকাল এসব মর্যাদাবান ছাহাবীদের জীবনী বই পাওয়া যায়। ছাহাবীদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারলে আমরা এটাও জেনে যাবো যে ইসলামে কোনো শর্টকাট নেই। একেকজন ছাহাবীর জীবন একেকটা জ্বলন্ত মশালের মতো, আলো ছড়িয়ে যায় যুগ যুগ ধরে। ইসলামের জন্যে সীমাহীন ত্যাগ আর কঠিন কঠিন সব পরীক্ষায় চমৎকারভাবে তাঁদের উৎরে যাওয়া, এসব সম্পর্কে জানতে পারলে একজন মুসলিমের (হোক সে যত দুর্বল ঈমানের অধিকারী) হিরোদের তালিকায় কখনোই ছাহাবায়ে কেরামদের চেয়ে উপরে অন্য কেউ (নবী-রাসূল ব্যতীত) স্থান পেতে পারবে না, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। এই হিরোদের সম্পর্কে জানতে পারলে আমাদের ইসলামের প্রতি আনুগত্য বাড়তে পারে আর বর্তমান যুগে আমাদের ভুলগুলো শোধরানোর তাগিদ পেতে পারি। লাভগুলো সব আমাদেরই।

আমরা যারা সাধারণ মুসলিম, ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি কিছু জানি তারা হয়তো চার খলীফা, হযরত বেলাল, আবু হুরায়রা, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এবং আরো অল্প কয়েকজন ছাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে সামান্য কিছু জানি। এমন আরো অসংখ্য ছাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন যাদের যে কারও জীবন-আলোচনা আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে যথেষ্ট। রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করা ছাহাবী হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) এমন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমার অত্যন্ত পছন্দের একজন হলেন মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)। যতবার আমি তাঁর সম্পর্কে পড়ি, আমার চোখদুটো টলমল করতে থাকে।

হযরত মুসআব (রাঃ)-এর মা ছিলেন প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক। ধনীর দুলাল মুসআব (রাঃ) বেড়ে উঠেছিলেন বিপুল ভোগ-বিলাসের মধ্যে। মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন যুবক ছিলেন তিনি। তাঁর থেকে উত্তম পোষাক মক্কার আর কেউ পরতো না। ইতিহাসবিদরা বলেন, মুস‘আব ইবনে উমাইর (রাঃ) ছিলেন মক্কার সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধী ব্যবহারকারী। মক্কার সকল মজলিশ আর বৈঠকে তিনি ছিলেন খুব কাঙ্খিত একজন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, ব্যক্তিত্ব আর উন্নত ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করতো। সুদর্শন আর ধনীর আদুরে দুলাল এই সদ্য যুবক দারুল আরকামে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়্যতের প্রথমদিকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) দারুল আরকামে তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা হাতেগোনা মুসলিমদের ইসলাম শিক্ষা দিতেন। এরকম একটা সময়ে মুসআব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টা মায়ের কাছে গোপন রাখেন, তাঁর মা ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। মাকে ভয় করতেন তিনি খুব বেশী। একপর্যায়ে মায়ের কাছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর প্রকাশ হয়ে পড়লো। অবশেষে মুসআব (রাঃ)-কে গৃহবন্দী করা হলো। বাধ্য হয়ে তিনি একদিন ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন এবং পরবর্তীতে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশা থেকে মক্কায় আসার পর তিনি তাঁর মাকে ইসলাম কবুল করতে বলেন। মা উত্তর দেন, ‘আমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করবো না’। এরপর মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-কে তাঁর মা বাড়ী থেকে খালি হাতে বিতাড়িত করে দেন। কুরাইশদের সেই আদুরে দুলাল এরপর থেকে মোটা শতছিন্ন তালিযুক্ত কাপড় পরেন। তাকে একদিন খাবার খেলে অন্যদিন অভুক্ত থাকতে হতো। একদল ছাহাবী একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে বসা ছিলেন। তারা দেখতে পেলেন মুসআব (রাঃ) হেঁটে যাচ্ছেন, পরনে শত তালি দেয়া মোটা একটা পোষাক। একদম হতদরিদ্র অবস্থা। সম্মানিত পাঠক, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সকল মুসলমানরা তখন কঠিন সময় পার করছিলেন। ছাহাবীরা সবাই তখন একজন আরেকজনের তীব্র কষ্ট দেখে অভ্যস্ত ছিলেন। এমন একটা সময়ে মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-এর এমন করুণ অবস্থা দেখে ছাহাবীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবান্তর হলো। তাদের দৃষ্টি নত হয়ে গেলো। অনেকের দুই চোখে ভেঙে পানি এসে গিয়েছিলো। তারা কল্পনা করছিলেন মুস‘আবের ইসলাম পূর্ব জীবনটা, কত কোমল আর সুগন্ধিময় ছিলো, কত প্রাচুর্য পরিবেষ্টিত ছিলো!

রাসূল (ছাঃ)-এর এই ছাহাবী ইসলামের জন্যে কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, পাঠক কল্পনা করুন।

উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মুসলিম বাহিনীর পতাকা এই মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিমরা বিপর্যয়ে পড়ে যান। এমন সংকটময় অবস্থায় কুরাইশ বাহিনী রাসূল (ছাঃ)-কে ঘিরে ফেললো। মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি তখন চিৎকার করে তাকবীর দিয়ে আর ঝাণ্ডা হাতে লাফ-ঝাপ দিয়ে কাফিরদের দৃষ্টি নিজের দিকে নিয়ে আসতে চাইলেন। কাফিররা তার প্রতি দৃষ্টি ফেরালো। একহাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা আর অন্যহাতে তরবারী নিয়ে তিনি প্রচণ্ড বেগে লড়াই করতে থাকেন। এক অশ্বারোহীর তরবারীর আঘাতে তার ডান হাতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবারে তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন। আরেকটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটাও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি তখন বলে ওঠেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ যা পরবর্তীতে কোরআনের আয়াত হিসেবে নাযিল হয় *(আলে ঈমরান ১৪৪)*। দুই বাহু দিয়ে এবার তিনি ইসলামের পতাকা তুলে ধরেন। এবার বর্শার একটা তীব্র আঘাত তাকে পরাভূত করে। পতাকাসহ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

যুদ্ধ শেষে রক্ত আর ধুলোবালিতে একাকার মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-এর লাশ খুঁজে পাওয়া গেলো। তাঁর লাশ দাফনের জন্যে অল্প এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলো না। এই কাপড়টা দিয়ে তাঁর সমস্ত শরীর ঢাকা সম্ভব হলো না। অবশেষে রাসূল (ছাঃ) মাথার দিকটা চাদর দিয়ে আর পায়ের দিকটা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়ার আদেশ করলেন। লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, ‘মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে’ *(আহযাব ২৩)*। তারপর কাফনের দিকে তাকিয়ে বললেন, لقد رأيتك بمكة وما بها أحدٌ أرق حلةً ولا أحسن لمةً منك، ثم أنت شعث الرأس في بردة ‘আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি, সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর আর সুন্দর যুলফী আর কারো ছিলো না। আর আজ তুমি এই চাদরে ধুলি-মলিন অবস্থায় পড়ে আছো’ *(তাবাক্বাত ইবনু সা‘দ, ৩/১২১ পৃ., কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকেদী ১১৭ পৃ.)*।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। আমাদের এ কাজের প্রতিদান দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। আমাদের মধ্যে যারা তাঁদের এ কাজের প্রতিদান মোটেও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাঁদের একজন মুস‘আব ইবনে উমাইর *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৯৬)*।

পার্থিব জীবনের কাজের দ্বারা পরকালের অনন্ত জীবনে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা এমন সব কৃতি মানুষকেই তো যুগে যুগে সকল মুসলিমদের ‘আইডল’ হিসেবে মানা উচিত। আমরা কাদেরকে আইডল মানছি?।

অমুসলিমদের যবানীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-১

-মেহেদী আরীফ

(১) টমাস কার্লাইল বলেন, "The lies (Western slander) which well-meaning zeal has heaped round this man (Muhammad) are disgraceful to ourselves only." *(Heroes and Hero Worship and the Heroic in History, 1840)*.

'যে মিথ্যাগুলো (পশ্চিমা বিদ্বেষমূলক প্রচার) সৎ অভিপ্রায়বিশিষ্ট এই মানুষটির (মুহাম্মাদ) চারপাশে সঞ্চিত করা হয়েছে কেবলমাত্র তা আমাদের জন্য লজ্জাকর'।

(২) Edward Gibbon বলেন, "The greatest success of Mohammads life was affected by sheer moral force." *(History of the Saracen Empire, London, 1870)*.

'মুহাম্মদের জীবনের বৃহৎ সাফল্য অর্জিত হয়েছিল এক নির্ভেজাল নৈতিক শক্তির প্রভাবে'।

(৩) Lane-Poole বলেন, He was the most faithful protector of those he protected, the sweetest and most agreeable in conversation. Those who saw him were suddenly filled with reverence; those who came near him loved him; they who described him would say, "I have never seen his like either before or after." He was of great taciturnity, but when he spoke it was with emphasis and deliberation, and no one could forget what he said... *(Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad)*.

'তিনি যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশ্বস্ততম নিরাপত্তাদানকারী এবং সর্বাধিক সুমিষ্টভাষী ও সদালাপী। যারা তাকে দেখতে আসতেন, তাদের অন্তর অকস্মাৎভাবে শ্রদ্ধায় ভরে উঠত। যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন তারা তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর ব্যাপারে যারাই আলোচনা করতেন তারা বলতেন, 'পূর্বে ও পরে আমি তাঁর মত মানুষ আর দেখিনি'। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন কথা বলতেন তখন এত গুরুত্বসহকারে ও বিচক্ষণতার সাথে বলতেন যে, সে বক্তব্য কারো পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হত না'।

অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং কুরআন স্রষ্টার একত্বের একটি মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত। পার্থিব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেবলমাত্র স্রষ্টার কিংবা তাঁর ফেরেশতাদের পরেই মানব জাতির বিশ্বাসের উপরে এরূপ আইনসম্মত রাজদন্ড পরিচালনা করা সম্ভব।

(৪) Dr. Gustav Weil বলেন, Muhammad was a shining example to his people. His character was pure and stainless. His house, his dress, his food - they were characterized by a rare simplicity. So unpretentious was he that he would receive from his companions no special mark of reverence, nor would he accept any service from his slave which he could do for himself. He was accessible to all and at all times. He visited the sick and was full of sympathy for all. Unlimited was his benevolence and generosity as also was his anxious care for the welfare of the community *(History of the Islamic Peoples)*.

'মুহাম্মাদ তাঁর জনগণের কাছে ছিলেন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর চরিত্র ছিল বিশুদ্ধ ও কালিমামুক্ত। তাঁর আবাস, তাঁর পোশাক-আশাক, তাঁর খাবার-দাবার ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য ছিল অপূর্ব সরল ও সাধারণ। তিনি এতটাই আত্মশ্লাঘামুক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁর সাথীদের থেকে সম্মানীসূচক কিছুই গ্রহণ করতেন না। এমনকি তিনি যে কাজ নিজে করতে পারতেন তা কখনও তাঁর ক্রীতদাস থেকে গ্রহণ করতেন না। তিনি যখন-তখন সর্বস্তরের মানুষের সেবায় নামতে পারতেন। তিনি অসুস্থকে দেখতে যেতেন। সকলের প্রতি তিনি ছিলেন দয়ার্দ্রপ্রাণ। তাঁর বদান্যতা ও উদারতা এবং সমাজের কল্যাণে তাঁর উদ্বেগ ও পেরেশানী ছিল সীমাহীন'।

(৫) Annie Besant বলেন, It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knew how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme. And although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel, whenever I reread them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher *('The Life and Teachings of Mohammad,' Madras, 1932)*.

'সৃষ্টিকর্তার অন্যতম মহান দূত আরবের এই নবীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব না করাটা সেই লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব যে তার জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে এবং শিক্ষাদান প্রণালী ও জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখে। আমি যা কিছু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি তার অনেক কিছুই হয়তো আপনাদের কাছে পরিচিত, কিন্তু তবুও আমি যখনই সেগুলো পুনঃঅধ্যয়ন করি, তখনই সেই মহান আরবীয় শিক্ষকের প্রতি নতুন করে প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা অনুভব করি।'

(৬) W.C. Taylor বলেন, So great was his liberality to the poor that he often left his household unprovided, nor did he content himself with relieving their wants, he entered into conversation with them, and expressed a warm sympathy for their sufferings. He was a firm friend and a faithful ally *(The History of Muhammadanism and its Sects)*.

'গরীবের প্রতি তাঁর বদান্যতা এতটাই অধিক ছিল যে, তিনি প্রায়ই নিজ সংসারকে মাহরুম করে হলেও তাদের অভাব মোচন না করা পর্যন্ত পরিতুষ্ট হতে পারতেন না। তিনি তাদের সাথে কথাবার্তায় সঙ্গ দিতেন এবং তাদের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন একজন পরম বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সহযোগী।

(৭) Michael Hart বলেন, My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level. ...It is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. ...It is this unparalleled combination of secular and religious



influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history *('The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History,' New York, 1978)*.

'বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের তালিকার শীর্ষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমার চয়ন করায় অনেক পাঠক বিস্মিত হতে পারেন এবং কারো কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এটাই সত্য যে, তিনিই মানব ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ইহজাগতিক উভয়ক্ষেত্রেই সর্বাধিক সফল।....সম্ভবতঃ ইসলামের উপর মুহাম্মাদের তুলনামূলক যে প্রভাব, তা খৃষ্টধর্মের উপর যিশুখ্রিষ্ট এবং সেন্ট পলের সম্মিলিত প্রভাবের চেয়ে অধিকতর বেশি।....আমার মনে হয়, এই অতুলনীয় ধর্মীয় ও ইহজাগতিক সুসমন্বয়ই মুহাম্মাদকে মানবজাতির ইতিহাসে একক ব্যক্তি হিসাবে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে'।

'নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক হিসাবে এবং অতুলনীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর তেরশ' বছর পর আজও তার প্রভাব তেমন প্রবল ও ব্যাপ্তিশীল'।

(৮) Dr. William Draper বলেন, Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born in Mecca, in Arabia, the man who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race... To be the religious head of many empires, to guide the daily life of one-third of the human race, may perhaps justify the title of a Messenger of God *(History of Intellectual Development of Europe)*.

'জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে মানুষটি, সকল মানুষের মধ্যে তিনি মানবজাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন.....বহু সাম্রাজ্যের ধর্মীয় গুরু হিসাবে পরিগণিত হওয়া এবং মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পথপ্রদর্শক হওয়াই সম্ভবত তার জন্য 'ঈশ্বরের দূত' হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করেছে'।

(৯) Stanley Lane-Poole বলেন, He was one of those happy few who have attained the supreme joy of making one great truth in their very life spring. He was the messenger of One God, and never to his life's end did he forget who he was or the message which was the marrow of his being. He brought his tidings to his people with a grand dignity sprung from the consciousness of his high office, together with a most sweet humility *(Studies in a Mosque)*.

'তিনি ছিলেন সেই সব সুখী মানুষের একজন যিনি জীবনের বসন্তে মহান সত্যের সীমাহীন আনন্দ অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একক ঈশ্বরের বার্তাবাহক এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কখনই ভুলে যাননি তিনি কি ছিলেন কিংবা তাঁর আনীত সেই বার্তা, যা ছিল তাঁর অস্তিত্বের মজ্জাস্বরূপ। বিনয় ও দীনতার পরম মধুময় বেশ নিয়ে এবং স্বীয় মহান দায়িত্বের চৈতন্য থেকে উদ্গত মর্যাদার উচ্চাসনে বসে তিনি মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিয়েছিলেন'।

(১০) Rodwell বলেন, Mohammad's career is a wonderful instance of the force and life that resides in him who possesses an intense faith in God and in the unseen world. He will always be regarded as one of those who have had that influence over the faith, morals and whole earthly life of their fellow men, which none but a really great man ever did, or can exercise; and whose efforts to propagate a great verity will prosper *(The Preface to his translation of the Holy Qur'an)*.

'মুহাম্মাদের কর্মজীবন হল তাঁর দেহ মধ্যস্থ সক্রিয়তা ও প্রাণবন্ততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ঈশ্বর ও অদৃষ্টের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা এবং স্বীয় জনগণের সমগ্র জাগতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হওয়া এমন সব মহামানবদের মধ্যে তিনি সর্বদা অন্যতম একজন হিসেবে বিবেচিত হবেন। কেননা একজন প্রকৃত মহামানব ছাড়া এমন কিছু কেউ করতে পারে না কিংবা প্রয়োগ করতে পারে না এবং একটা মহাসত্যকে প্রচারের চেষ্টা কারো এত সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না'।

(১১) George Bernard Shaw, বলেন, "I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of

existence which can make itself appeal to every age. "I have studied him (Muhammad PBUH) - the wonderful man and in my opinion for from being an anti-Christ, he must be called the Savior of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness."*(The Genuine Islam).*

'আমি সর্বদাই মুহাম্মাদের ধর্মকে উচ্চ মূল্যায়ন করি এর মধ্যস্থ অনন্য সাধারণ প্রাণশক্তির কারণে। আমার কাছে মনে হয়েছে এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা রাখে এবং যার আবেদন সর্বযুগেই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। আমি মুহাম্মাদের জীবনী পাঠ করেছি। তিনি এমন এক অসাধারণ মানুষ যাকে এ্যান্টি ক্রাইস্ট বা যিশুবিরোধী না বলে বরং অবশ্যই অভিহিত করা উচিৎ মানবজাতির ত্রাতা হিসাবে। আমি বিশ্বাস করি তার মত একজন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্ব পরিচালনার জন্য একনায়ক শাসক হিসাবে নিয়োজিত হতেন, তবে এ বিশ্বের সমস্যাগুলো তিনি এমনভাবে বিদূরিত করতে সক্ষম হতেন যে, বহুল প্রত্যাশিত সুখ ও শান্তি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসত'।

(১২) Leo Tolstoy বলেন, "Muhammad has always been standing higher than the Christianity. He does not consider god as a human being and never makes himself equal to God. Muslims worship nothing except God and Muhammad is his Messenger. There is no any mystery and secret in it" *(The Prophet Muhammed's Words and Behaviour)*.

'মুহাম্মাদ খৃষ্টবাদ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। তিনি ইশ্বরকে কোন মানবিক স্বত্তা রূপে কল্পনা করেননি এবং কখনই নিজেকে ইশ্বরের সমকক্ষ হিসাবে স্থাপন করেননি। মুসলমানরা ইশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না এবং মুহাম্মাদকে কেবল তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে। এতে কোন রহস্য ও গোপনীয়তার স্থান নেই'।

(১৩) মহাত্মা গান্ধী বলেন, I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind.... I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of the Prophet's biography), I was sorry there was not more for me to read of that great life. *(statement published in 'Young India,'1924).*

'আমি জানতে চেয়েছিলাম সর্বাধিক উত্তম এমন কারো জীবনী সম্পর্কে যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তর জুড়ে অবিসংবাদিত প্রভাব বিস্তার করে আছেন।...আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পারছি যে, সেই সময় মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে ইসলামের যে বিজয় ঘটেছিল, তা তরবারীর জোরে আসেনি। বরং তা এসেছিল পরম সরলতা, নবীজীর প্রবল আত্মপ্রচারবিমুখতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে সতর্কতা, বন্ধু ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি গভীর অনুরাগ, নিঃশংকচিত্ততা, নির্ভীকতা এবং আল্লাহ্র প্রতি ও নিজের দাওয়াতী মিশনের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীলতার মাধ্যমে। তরবারীর মাধ্যমে নয়, বরং এসব গুণাবলীর মাধ্যমেই বিজয় মুসলমানদের হাতে ধরা দিয়েছিল এবং তাদেরকে যাবতীয় বাধা-বিপত্তির পাহাড় পাড়ি দিতে সহায়তা করেছিল। আমি যখন তাঁর (নবীর) জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়ে শেষ করলাম, আমার আফসোস হচ্ছিল এজন্য যে, এই মহান জীবনীর আরও কিছু পড়া বাকি রয়ে গেল'।

(১৪) Alphonse de Lamartine বলেন, "Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire: that is MUHAMMAD. As regards all the standards by which human greatness may be measured, we may well ask IS THERE ANY MAN GREATER THAN HE? *(History of Turkey Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol. 11 pp. 276-277).*

'একাধারে দার্শনিক, বক্তা, সংস্কারক বা নতুন মতবাদের প্রচারক, আইনপ্রণেতা, যোদ্ধা, বিজয়ী, যৌক্তিক ধর্মমতের পুনরুদ্ধারকারী, প্রতিমাহীন উপাসনাপদ্ধতি উদ্ভাবনকারী, একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন মুহাম্মদ (ছাঃ)। মানুষের মহত্ব পরিমাপের সকল মানদণ্ড অনুসারে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি তার চেয়ে বড় আর কেউ আছেন কি?'

(১৫) তিনি আরো বলেন, "If greatness of purpose, smallness of means, and astonishing results are the three criteria of a human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad?"

'উদ্দেশ্যের মহত্ব ও উপকরণের স্বল্পতার সাথে বিস্ময়কর ফলাফল অর্জন যদি হয়ে থাকে অতিমানবীয় প্রতিভার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত; তবে ইতিহাসে এমন আর কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়ার সাধ্য কি কারো আছে যাকে মুহাম্মাদের সাথে তুলনা করা সম্ভব?'

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাবি]

আমি সিগারেট খাই না, কিন্তু আমি পকেটে একটি ম্যাচ রাখি। এজন্য যে, যখনই আমার অন্তর পাপের দিকে ধাবিত হয়, আমি ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে আমার হস্ততালুতে চেপে ধরি আর বলি, হে আলী! তুমি এই সামান্য ম্যাচের কাঠির আগুন সহ্য করতে পারছ না, তাহ'লে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন তুমি কিভাবে সহ্য করবে?

-বক্সার মুহাম্মাদ আলী

পাহাড়ের বুকে অন্য বাংলাদেশ

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

স্বপ্নডানায় ভর করিয়া..

প্রতিবার কক্সবাজার যাওয়ার পথে দিগন্তরেখায় নীলবর্ণ সারি সারি পাহাড়ের নীল হাতছানি মনটা ব্যাকুল করে তুলত। মুগ্ধ বিহ্বলতা নিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতাম সেদিকে দৃষ্টিসীমা যতদূর যায় ততদূর। তবে সশরীরে ঐ সুউচ্চ পাহাড়ের দেশে যাওয়া যায় বা পর্বতারোহনের সুযোগ কখনও মিলবে তা ভাবনাতেই আসেনি। বাসের জানালায় ধরা দেয়া এই রহস্যাবৃত নীল সৌন্দর্যরাশি কেবল কল্পনায় ডুবে ডুবে উপভোগ করতে হয়-এ পর্যন্তই ছিল অনুভূতির সীমানা। দু'বছর আগে মূসা ইবরাহীম নামের বাংলাদেশী পর্বতারোহী যখন হিমালয় চূড়া ছুঁলেন, তখন থেকে পত্র-পত্রিকায় পর্বতারোহনের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে আসতে লাগল। আর সে সূত্রেই বেশকিছু ফিচার পড়লাম বাংলাদেশের সরকারীভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ পর্বতচূঁড়া কেওকারাডং আরোহন সম্পর্কে। এসব পড়ে মনের ভিতর বার বার উঁকি দিতে লাগল কীভাবে ঐ নীল পাহাড়ের দেশকে পদানত করা যায়। একরাশ বিস্ময় হয়ে যে দুর্গম পাহাড় এতদিন শুধু কল্পনায় ধরা দিত, তাকে আপন করে পাওয়ার নেশা ভালমতই পেয়ে বসল।



স্বপ্ন থেকে বাস্তবে :

কেওকারাডং আরোহনের জন্য টানা ৫/৬ দিন সময় হাতে রাখা প্রয়োজন। একাধারে কয়েকদিন ছুটি মিলানো, উপযুক্ত ভ্রমণসঙ্গী পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়লেও শেষমেশ বর্ষা পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসকেই বেছে নেয়া হল সফরের জন্য। ঢাকায় আমাদের কর্মী সম্মেলন ২০ সেপ্টেম্বর'১২। পূর্ববর্তী ২ সপ্তাহ সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য খুব ব্যস্ততায় কেটেছে। ক'দিন বিশ্রাম প্রয়োজন। এই বিশ্রামের সময়টুকু সফরের জন্য উপযুক্ত পুঁজি মনে করে পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর সায়দাবাদ থেকে বিকাল ৫টায় চট্টগ্রামের বাস ধরলাম। সফরসঙ্গী নাজীব ও কাফী ভাই। পরের দিন আসবে মাহফুজ। রাত প্রায় ১২টার দিকে পাহাড়তলীতে আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছলাম। পরদিন বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সরঞ্জামাদি কিনে ফেললাম। সন্ধ্যায় রাস্তায় জ্যামে পড়ে পতেঙ্গা বীচের মিষ্টিরোদে ভাজা ঢেউয়ের তোড় দেখার সুযোগ না পেলেও রাতের চন্দ্রবিধুর সমুদ্র দর্শন বেশ উপভোগ্যই হল। বাসায় ফিরে জানতে পারলাম আগামীকাল হরতাল।

যাত্রা শুরু :

পরদিন ভোর ৫টার পূর্বেই আমরা ৪ জন বের হলাম বাসা থেকে। উদ্দেশ্য ঢাকা থেকে আসা নাইটকোচ ধরে বান্দরবান যাওয়া। কর্ণেলহাটে ঢাকা বাস কাউন্টারে গিয়ে জানা গেল ২০ মিনিট আগেই গাড়ি চলে গেছে। ফলে বহাদ্দারহাট বাস টার্মিনালে গিয়ে কাটা গাড়ি ধরা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি কোন ধরনের যানবাহন নেই। প্রায় ১ ঘণ্টা চলে গেল তবু কোন ব্যবস্থা হল না। শংকায় পড়ে গেলাম। পরে একটা বাস পাওয়া গেল কর্ণফুলী ব্রীজ পর্যন্ত। সেখান থেকে ভাগ্যক্রমে কেরাণীরহাটগামী একটি মাইক্রোবাস পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। সকাল ৮টার মধ্যেই কেরাণীরহাট পৌঁছলাম। কেরাণীরহাট থেকে বান্দরবান আরো প্রায় ২৫ কিলোমিটার। সিএনজিতে রওয়ানা হলাম। বেলা পৌনে ন'টার দিকে বান্দরবান শহরে পৌঁছলাম। সকালের নাস্তা সারলাম জামান হোটেলে। ছিমছাম ছোট্ট শহর বান্দরবান। দোকানপাটে উপজাতীয়দের আনাগোনা বেশ। এক দোকান থেকে অডোমস ক্রীম, স্যালাইন, গ্লুকোজ, ব্যাণ্ডেজ, চকলেট, বিস্কুট ইত্যাদি কিনে ফেললাম। সামনে ৩ দিন পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া সেখানে দুষ্কর। বান্দরবান থেকে রুমা বাজার যেতে হবে। অটোবাইকে চড়ে রুমা বাসস্টাণ্ডে এসে বাসের অপেক্ষা। হরতালের দিন যাত্রী নেই বলে বাসও ছাড়ে না। অবশেষে ঘন্টাখানিক পর আসন পূর্ণ হলে বাস ছাড়ল। উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা। প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ যেতে হবে এই সংকীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। কয়েকমাস পূর্বে চাঁদের গাড়িই ছিল একমাত্র ভরসা। সেনাবাহিনী পীচের রাস্তা করে দেয়ায় এখন বাস চলাচল করছে। শীঘ্রই কানে চাপ আর ব্যথা অনুভূত হতে লাগল। পাহাড়ী পথে এটা খুব সাধারণ উপসর্গ। রাস্তার দুই ধারে যতদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ ধূসর পাহাড়ী উপত্যকা। মনে হয় যেন বিমান থেকে ভূমির দৃশ্য দেখছি। শীতের শুরু হয়নি। কিন্তু কুয়াশার মত আবছা নীল দৃশ্যপট। অনেক নীচে পাহাড়ের বাক ঘুরে ঘুরে বয়ে চলেছে সাঙ্গুর ফিতের মত চিকন স্রোতধারা। বিশাল উপত্যাকায় কেবলই পাহাড়। বাড়ী-ঘর তেমন দেখাই যায় না। মাঝে মাঝে যখন দুই পাহাড়ের ভয়ানক দর্শন গিরিখাত দিয়ে ওপারের বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল, তখন মনের অজান্তেই বারবার বেরিয়ে আসছিল সুহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। চিম্বুক রেঞ্জের উঁচু পাহাড়ের সারি বাসের জানালা দিয়ে ঘাড় নীচু করে দেখতে হচ্ছে। তারই এক চূঁড়ায় সুসজ্জিত অবকাশকেন্দ্রের ছাউনি দেখা গেল। মাহফুজ বলল, ওটাই নীলগিরি। চোখ ফিরাতে পারছি না জানালা থেকে। সর্বাধিক শক্তিশালী ক্যামেরারও সাধ্য নেই এই অনিন্দ্য সৌন্দর্যরাজির প্রকৃত রূপকে বন্দী করার। খুব কামনা করছিলাম গাড়ি থামুক কিছুক্ষণ। দু'চোখ ভরে প্রকৃতির এ রূপসুধা গলধঃকরণ করি। অবশেষে চাকা পাংচার হওয়ায় গাড়ি থামল বটে, তবে স্বপ্নরাজ্যের মত সেই ভ্যালিটি পার হয়ে এক জঙ্গলময় পাহাড়ঢাকা বাঁকের উপর থামল। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পার্শ্বে গভীর খাদের কিনারে আসতে হাইটোফোবিয়ায় গা শির শির করে উঠল। গাড়ি সারাইয়ের পর আবার যাত্রা শুরু। বেলা পৌনে ২টার দিকে গাড়ী থামল কাইখ্যাংঝিরিতে। রাস্তা থেকে নীচে সাংগু নদী পর্যন্ত দীর্ঘ সিঁড়ি পার হয়ে ইঞ্জিন নৌকায় চড়লাম। সহযাত্রীরা অধিকাংশই উপজাতি। ভাষা কিছুই বোঝা যায় না। ২টার দিকে যাত্রা শুরু হল সাংগুর বুক চিরে। দুই তীরে পাহাড়ের সারি। বেশ খরস্রোতা কিন্তু অগভীর নদীর বুকে পাহাড়ের ছায়া আর রোদের লুকোচুরি চলছে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। জংলী কলা আর নাম না জানা

গাছ ও লতাপাতায় ছেয়ে আছে পাহাড়গুলো। সামনে বহুদূরে নীল চাদর জড়িয়ে যেন পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরবর্তী পাহাড়গুলো। নদীর কিনার ঘেঁসে ভেসে যাচ্ছে থরে থরে সাজানো পাহাড়ী বাঁশের আটি। ছোট ছোট ক্যানুর মত দাড় বাওয়া নৌকাও দেখা যায়। প্রকৃতি সৌম শান্ত নীরব। এমনি মৌন পাহাড়ঘেরা দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনায় কেবলই ভাসছে ডকুমেন্টারীতে দেখা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর ভয়ংকর সব বাঁক আর সেখানকার কোন দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার দৃশ্য। আমরা যেন আর আমরা নেই; অজানার পানে আজ আমরা যেন আবিষ্কারের নেশায় ধাবমান একদল অভিযাত্রী। পথিমধ্যে পড়ল নদীর উপর নবনির্মিত রুমা ব্রীজটি। জানতে পারলাম আগামী ১৫ অক্টোবর এটির উদ্বোধন হবে। তখন আর রুমা যেতে নৌকার এই মনোমুগ্ধকর যাত্রার প্রয়োজন হবে না। মনটা অকারণেই খারাপ হয়ে যায়। হয়তবা দেশের বাড়ীর যাত্রাপথে পদ্মার বুক চিরে ফেরী পার হওয়ার সেই হারানো স্মৃতি মনে করে। প্রায় ঘন্টাখানিক পথ চলার পর এক চমৎকার পাহাড়ঘেরা ইউটার্নের মুখে এসে নৌকা থামে। ঘাটে নেমে লম্বা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। এটাই বিখ্যাত রুমা বাজার। রুমা থানার আয়তন অনেক বড়। কেওকারাডং অতিক্রম করে সেই সুদূর তাজিনডং পাহাড় পর্যন্ত বিশাল এলাকার প্রাণকেন্দ্র এই রুমা বাজার। বাঙালীদের চেয়ে উপজাতীয়দেরই বেশী চোখে পড়ল। লম্বা পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে উপজাতীয়রা এই বাজারেই সদাই করে। মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, চার্চ কি নেই এই বাজারে। প্রবেশমুখেই তিনটি রেস্টহাউজ। নতুন ও তুলনামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে 'আরণ্যক রিসোর্টে' উঠলাম আমরা। মালিকের বাড়ি সাতকানিয়া। আমাদের বেশ সমাদর করলেন। অফ সিজন হওয়ায় পর্যটকশূন্য হোটেল। নিরিবিলি পরিবেশ। আমাদের বেশ সুবিধাই হল। সাংগু নদীতে গোসল করব চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু পানি ঘোলা দেখে বাদ দিলাম সে চিন্তা। বিকালে হোটেল মালিক আমাদেরকে একজন গাইড ঠিক করে দিলেন। কিন্তু গাইড চার্জ শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ। ধারণার চেয়ে অনেক বেশী। যাইহোক উপায়ন্তর না দেখে রাজী হয়ে গেলাম। গাইড জানাল, নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে তার মত প্রায় ৭০ জন গাইড এই দুর্গম পাহাড়ী পথে টুরিস্টদের সেবা দিয়ে জীবিকা অর্জন করছে। গাইডের পরামর্শ মোতাবেক পাহাড়ী পথে চলাচলের উপযোগী গ্রীপযুক্ত সস্তা রাবারের স্যান্ডেল কিনে নিলাম। রাতে স্থানীয় সাতকানিয়া হোটেলে খাওয়ার পর বাজার মসজিদে ছালাত আদায় করলাম। আমাদের ছালাত আদায়ের ভিন্ন ধরন দেখে মসজিদের মুছল্লীদের দৃষ্টি সব আমাদের দিকে। তবে পর্যটন এলাকা বলে হয়ত বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হাটতে হাটতে সাংগুর ঘাটে আসলাম। শুক্লাপক্ষের আধফালি চাদের মৃদু আলো তখন নদী ও পাহাড়ে জেঁকে বসা আঁধারকে ঘোচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় রত। মেঘের আনাগোনায় আকাশের দেশে ব্যস্ততার আভাস। সারি বেধে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকাগুলোর একটার ছাদে উঠে প্রায় ঘন্টাখানিক নদী, পাহাড় ও চাঁদের মিলিত সম্ভাষণে সিক্ত হলাম। মাহফুয, নাজীব, কাফী ভাই ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ওদেরকে 'চন্দ্রাহত' হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে অনেকটা জোর করেই এনেছিলাম। সবাই মিলে পরিবেশটা খুব উপভোগ করলেও ঘুমের কাছে হার মেনে হোটেলে ফিরতে হল। রাতে খুব ভাল ঘুম হল।


রুমাবাজার ঘাট

রুমাবাজারের সকাল :

এক ঘুমে রাত শেষ হল। দ্রুত অযু সেরে মসজিদে গেলাম। ছালাতে মুছল্লীদের উপস্থিতি তুলনামূলক ভালই মনে হল। মুনাজাতের পর একটি বই বের করে হাদীছ পড়া শুরু করলেন ইমাম সাহেব। আমরা বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার সাংগুর তীরে নেমে এলাম। ভোরের সাংগুকে দেখায় খুব শান্ত ও স্নিগ্ধ। আজ রবিবার হাটের দিন। পাহাড় থেকে নৌকাযোগে আনা শত শত কলার কাঁদি ও তরি-তরকারী নামানো হচ্ছে ঘাটে। ঘাট থেকে একটু দূরে স্তূপীকৃত বাঁশের সারি সারি আঁটি। বিশেষ পদ্ধতিতে একটার একটা সাজিয়ে ভাসিয়ে আনা হয়েছে দূর-দূরান্ত থেকে। পানিতে পা ছুঁইয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঁচু পাহাড়ের উপর গ্রামটিতে উঠলাম। খাড়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে পা ব্যথা হয়ে গেল। গ্রামের ভিতরটা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঘর বেঁধে মাঝখান দিয়ে একেবারে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে বিরাট শহরই যে বানিয়ে ফেলেছে গ্রামবাসীরা। বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, ব্রাক, আশা, প্রশিকা কি নেই সেখানে! উপজাতীয়দের সদ্য ঘুম ভাঙ্গা কটমটে চোখের উঁকিবুকি দেখে আর বেশী না এগিয়ে নেমে এলাম নীচে।


রুমাবাজারস্থ সাঙ্গু নদীর ইউটার্ন

বগালেক অভিমুখে যাত্রা :

ঘাটে নেমে আসতেই গাইড আলমগীরের ফোন। তাড়াতাড়ি সকালের নাস্তা সেরে গোসল করে তৈরী হয়ে নিলাম ৭টার মধ্যে। চিরাচরিত পোষাক ছেড়ে নতুন বেশে পিঠে নতুন কেনা ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়তি জিনিসপত্র সব হোটেল লবিতে রেখে এসেছি। বেশ অভিযাত্রী অভিযাত্রী মুডে আছি সবাই। বাজারের পিছনে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। উপস্থিত অফিসারদ্বয় আমাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন। তাদের আন্তরিক ব্যবহার ও শুভকামনায় বেশ ভাল লাগল। রিপোর্টিং সেরে নীচে নেমে বিখ্যাত সেই ফোর হুইলার চাঁদের গাড়িতে চড়ার জন্য স্ট্যান্ডে আসলাম। হুডখোলা লোকাল গাড়িতে চাপাচাপি করে ১৮/২০ জন বসেছি। সামনের দিকে বসলাম গাইডসহ আমরা পাঁচজন। বাকি সবাই উপজাতি। পৌনে আটটার সময় যাত্রা শুরু হল। খানিকবাদেই গাড়ি থামল। পুলিশ বক্সে আবার রিপোর্ট করতে হবে। গাড়ি থেকে নেমে আবার নাম-ঠিকানা, গন্তব্য সব লিখতে হল। স্থানীয়দের অবশ্য এসব প্রয়োজন হয় না। বগালেকের যাওয়ার জনপ্রিয় ট্রেইল ঝিরিপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি খুব শক্তভাবেই বারণ করল ওপথে যেতে। বর্ষা মৌসুমে নাকি সেখানে নানা বিপদের আশংকা। যাইহোক মনের ইচ্ছা চাপা দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। সামনে ইট বসানো উঁচু পাহাড়ী পথ। গাড়ী প্রায় খাড়াভাবে উঠছে তো উঠছেই। মনে হল গাড়ী উল্টেই যাবে। শক্ত

করে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রয়েছি সামনের রড। পিছনের দিকে তাকালে ভয়ে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে উঠার পর এবার নামা শুরু হল। নামছে তো নামছেই। পুরোটা রাস্তাটাই এমন। রাস্তা থেকে অনেক নিচে সারি সারি পাহাড়। মেঘ, রৌদ্দুরের লুকোচুরিতে সবুজ পাহাড়ের রূপ অবশ্চর্যরকমভাবে ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। রাস্তার দুধারে ঘন নলখাগড়ার ঝাড় এমনভাবে ঝুকে আছে যে আমাদের গায়ে তা বার বার এসে লাগছে আর নানা জাতের পোকামাকড়ে শরীর ভরে যাচ্ছে। এভাবে বগামুখপাড়া পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় ১৩ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করতে ১ ঘন্টারও বেশী সময় লেগে গেল। ৯টার দিকে বগামুখপাড়ায় গাড়ি থেকে নামলাম। এবার পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু। ১৫ মিনিট হাটার পর পাহাড়ী সরু ট্রেইলে ঢুকে পড়লাম। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে হাটছি। সামনে পিছনে ডানে বামে চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তন্ময় হয়ে সেসব দৃশ্য দেখছি আর বার বার হোচট খাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর দেখি সাথীরা অনেকটা সামনে এগিয়ে গিয়েছে। ওদের দেখতে পাচ্ছি না। আঁকাবাঁকা খাড়া ট্রেইলে দৌড় দিয়ে এগিয়ে ওদেরকে ধরার চেষ্টা করলাম। এতেই বাধল বিপত্তি। ওদেরকে নাগালের মধ্যে পেতে পেতে এতটাই হাপ লেগে গেল যে, মাটিতে শুয়ে পড়ার দশা। সবাই মিলে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম গাছের ছায়ায়। আবার উঠলাম। হাটা শুরু হল। কিন্তু না, পা চলতে চায় না। কিছুদূর এগিয়ে আবার রেস্ট। বুকটা এমন ধড়ফড় করছে যে তার আওয়াজ কানে শুনতে পাচ্ছি। মাহফুযেরও একই দশা। রোদের প্রখর তাপে ঘেমে নেয়ে হাঁস-ফাঁস অবস্থা। সামনের উঁচু পাহাড়টা পার হতে হবে জেনে একদম ভেঙ্গে পড়ার দশা। যাইহোক গাইড সাহস দিল। ঢাল বেয়ে উঠছি আর উঠছি। খানিকটা রেস্ট নেই, আবার এগুতে থাকি। কারো মুখে রা নেই। এভাবে কখন যেন পাহাড়ের মাথায় চলে এসেছি। নাজীব আর কাফী ভাই পাহাড় চূঁড়া থেকে ওপারে নেমে গেছে। আমি সবার পিছনে ভগ্নমনোরথে চূড়ায় উঠছি আর ভাবছি সামনে না জানি কত বড় পাহাড় অপেক্ষা করছে। কষ্টে মুখ ব্যাদান করে চূঁড়ায় উঠে দাড়ালাম। নিচে তাকিয়েই হতবাক। এ কি, আসমানের নীলাকাশ ভূমির বুকে আছড়ে পড়ল কিভাবে? পীতাভ সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর গর্ভে এমন মোহনীয় ঝকঝকে স্বর্গীয় নীল সরোবর? এ দৃশ্য দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। চোখ রগড়ে নিলাম। স্বপ্ন দেখছি না তো। মাহফুয কাছে এসে বলল এটাই তো সেই বগালেক। আমি বাকরুদ্ধ। সেই বিখ্যাত বগা লেক যে এতকাছে, তা তো একবারও বলেনি ঐ গাইড ব্যাটা? পাহাড়ের উপরে স্থানুর মত কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে এই বিপুল সৌন্দর্যরাশিকে প্রাণভরে


বগালেক

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে গিলতে লাগলাম। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলাম নিচের লোকালয়ে।

বগালেক পাড়ায় :

বগালেকের তীর ঘিরে বগালেকপাড়া। দক্ষিণ দিকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ব্যোম পাড়া, উত্তর দিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমা পাড়া। ব্যোমপাড়ায় পাহাড়ের ঢালের উপর আর্মী ক্যাম্প। ক্যাম্পের ভিতরে মসজিদ আছে। আর্মীরা এখানে জুম'আর ছালাতও আদায় করে। আমরা সোজা আর্মী ক্যাম্পে ঢুকে বসে পড়লাম। উপস্থিত অফিসারটি খুব আন্তরিকভাবে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিলেন। নাম-ধাম লিখে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বগালেকপাড়ায় ঢুকলাম। এ পাড়ায় ২৩টি পরিবার এবং ১৩২ জন অধিবাসী রয়েছে। লেকের অপর পাড়ে মারমা পাড়াতেও অনুরূপ জনসংখ্যা। গাইডের পরিচিত এক দোকানে ঢুকে গ্লাসের পর গ্লাস পানি সাবাড় করলাম আর পাহাড়ী কলা খেয়ে শক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। কাফী ভাই স্যালাইন ও গ্লুকোজ গুলে সবাইকে দিল। প্রায় আধাঘন্টা রেস্ট নিয়ে একটু চাঙা হলে গাইড তাড়া দিল কেওকারাডং অভিমুখে যাত্রা শুরুর জন্য। ১১টা বেজে গেছে। রওনা হচ্ছি। এ সময় মাহফুয বেঁকে বসল। সে আর যাবেই না। এই লম্বা পথ ট্রেকিং-এর কষ্ট সহ্য করার মত বিন্দুমাত্র শক্তি তার অবশিষ্ট নেই। আগামী দু'দিন সে বগালেকেই থেকে যাবে। তার সিরিয়াস ভঙ্গি দেখে আমি সাফ জানিয়ে দিলাম, 'দেখ, আমরা কাউকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আসিনি, তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। প্রয়োজনে আরো ১ ঘন্টা পর যাব। তোমাকে বাঁশের আঁকড়ায় বহন করে হলেও নিয়ে যাব, যদি হাটতে না পার'। ধমক খেয়ে সে অবশেষে নরম হল আর কিছু ছেলেমানুষী শর্ত জুড়ে দিল। সব শর্ত মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলাম। ওর জন্য ডবল দামে একটি রাবারের স্যাণ্ডেল কেনা হল। দোকানের সামনে বাঁশের লাঠি দেখে সবাই একটি করে নিলাম। পাহাড়ী অঞ্চল ভ্রমণে নবীশ ট্রেকারদের জন্য এই লাঠির কোন বিকল্প নেই। অথচ আমাদের গাইড কিছুই বলেনি। এজন্যই পিছনের পাহাড়টা অতিক্রম করে আসতে আমাদের এত কষ্ট হয়েছে। খুব রাগ হল গাইডের উপর।

বাংলাদেশের হিমালয় অভিমুখে :

বগালেকপাড়ার পূর্বদিকে আকাশছোঁয়া অন্তর হীম করা পাহাড়। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলে ছেয়ে আছে। মনে হচ্ছে সামনে গেলেই প্রকাণ্ড


বগালেক পাড়া

আনাকোণ্ডা বা কোন হিংস্র প্রাণী ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভর দুপুরেও একটানা ঝিঝির কান ঝালাপালা করা চিৎকার। পাখির কলরবও তাতে ঢাকা পড়েছে। ঢুকে পড়লাম বিচিত্র সব লতা-গুল্মে ঢাকা ট্রেইলে। বর্ষাকালে না আসলে প্রকৃতির এত রূপ বৈচিত্র্য হয়ত দেখা যেত না। শীতকালের ম্যাড়মেড়ে আবহাওয়ার সাথে এখনকার প্রাণবন্ত সবুজ প্রকৃতির কোন তুলনাই হয় না। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। এখনকার ট্রেইলটা আগের মত অতটা খাড়া নয়, বেশ সমতল। তাছাড়া হাতের লাঠিও বেশ উপকার দিচ্ছে। সরু পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছি। কখনও ঘন জঙ্গল, কখনো পাহাড়ের একেবারে কিনার ধরে হাটার পথ, যেখান থেকে একেবারে খাড়াভাবে নেমে গেছে গভীর খাদ। নলখাগড়া আর লতা-গুল্মের ঝোপের আড়ালে খাদের গভীরতা তেমন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু একটু খেয়াল করলে নীচে তাকালেই হৃদকম্প শুরু হয়ে যাচ্ছে। পথে বেশ কয়েকটি ঝর্ণা ও ঝিরি পড়ল। বিরাট বিরাট পাথরের ঢিবি ভেদ করে সেসব ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলে প্রকাণ্ড পাথরগুলো সেখানে এক আধিভৌতিক আবহ তৈরী করে রেখেছে। ভগ্ন মাটির ঢিবিই হয়ত শত শত বছর ধরে ঝর্ণার অব্যাহত স্রোতের তোড়ে কোন এক সময় পাথরে পরিণত হয়েছিল। তারপর কত শত বছরের ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে যে পাথরগুলো দাঁড়িয়ে আছে তা আল্লাহ্ই মা'লূম। আজলা ভরে ঝর্ণার শীতল পানি খেলাম। শ্রান্ত পথিকের জন্য এর চেয়ে প্রশান্তিকর বিনোদন আর কিই বা হতে পারে। পথে সবচেয়ে বড় যে ঝর্ণাটি পড়ল তার নাম 'চিনরি' ঝর্ণা। গাইড জানালো আসার পথে এই ঝর্ণার

উৎসস্থলের দিকে নিয়ে যাবে। প্রায় ঘন্টাখানিক হাটার পর রেস্ট নিলাম কিছুক্ষণ। যে মাহফুয কোন মতেই পাহাড়ে উঠবে না জানিয়ে দিয়েছিল, তাকে এখন দেখছি সবার আগে আগে। ও বলল, 'তোমার ধমক আমাকে তাতিয়ে দিয়েছে'। আমরা হাসলাম। আবার হাটা শুরু


বগালেক থেকে কেওকারাডং-এর পথে

হল। এক নাগাড়ে একের পর এক পাহাড় অতিক্রম করছি। প্রত্যেকের মাঝে বেশ ব্যবধান। কারো মুখে কোন কথা নেই। ট্রেকিং-এর সময় কথা বললে দম ফুরিয়ে আসে। চারিদিকে শত শত পাহাড়ের নির্বাক শোভা আর ঘন জঙ্গলের নৈঃশব্দ্য। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছি আর হাঁটছি। আরো ঘন্টাখানিক পার হয়ে গেল। একটা মোড়ের মত জায়গায় এসে আমরা থেমে গেলাম। এখানে রেস্ট নেওয়ার জন্য একটা ছাউনী ঘেরা জায়গা আছে। আমাদের আগেই ১৫/১৬ জনের এই পর্যটক দল ফিরতি পথে এখানে এসে রেস্ট নিচ্ছে। কেওকারাডং হয়ে তারা জাদিপাই ঝর্ণা পর্যন্ত গিয়েছিল। আমাদেরকেও উৎসাহ দিল জাদিপাই যাওয়ার জন্য। ওদের সাথে আরো বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। তারপর পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমরা আবার যার যার পথ ধরলাম। এখানে দাঁড়িয়েই সর্বপ্রথম কেওকারাডং শিখরের দেখা পেলাম। আকাশছোঁয়া কেওকারাডং রেঞ্জের ঢেউ খেলানো পর্বতশ্রেণীর সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ শিখরটিই হল আমাদের বহু কাংখিত কেওকারাডং। মেঘের আড়ালে চূড়াটি বার বার হারিয়ে যাচ্ছে। মাঝের বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর জুড়ে এক অসাধারণ ভ্যালি। সেখানে সারি সারি পাহাড়ের উপর লতা-গুল্মের অলংকারে সুসজ্জিত লম্বা লম্বা রেইনট্রির ঘন সবুজ বন আর তার উপরে মেঘ ও রোদের অদ্ভুত খেলা। একদিকে আলোয় ভরা সবুজ তো আরেক দিকে কালো ছায়ার আলেয়া। কি যে অসাধারণ লাগছে ভ্যালিটাকে। চোখ ফেরানো দায়।

বিজয় কেওকারাডং :

চূড়া দেখার পর শরীরে যথেষ্ট শক্তি ফিরে এসেছে। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার চাপা উচ্ছাসে মনটা উথাল-পাথাল করছে। ঠিক সে সময় বৃষ্টি নেমে এল। রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দের অপূর্ব ছন্দময় তান তুলছে। শো শো বাতাসে সে শব্দ কান পেতে শুনছি আর ঝংকৃত হচ্ছি। দুপাশ থেকে ভেজা লতা-পাতার অবুঝ ঝাপটা.. দূরের পাহাড়ে মেঘের দলের শান্ত-সমাহিত চলাচল.. আহা! এ পথ যদি শেষ না হত! অভিযাত্রী দলে সবার পিছনে ছিলাম আমি। প্রকৃতিকে আপন করে পেতে গিয়ে আরো পিছিয়ে পড়েছি। পাহাড়ের আড়ালে ওদের দেখা যায় না। নিঃসীম প্রকৃতির কোলে


দার্জিলিং পাড়া

কেবল আমি আর আমি। নির্জনতার সবটুকু উপভোগ করছি একান্তই নিজের মত করে। হঠাৎ মনে হল কোথাও কেউ নেই। অজানা শিহরণে আৎকে উঠে দৌড় দিলাম। অবশেষে সহযাত্রীদের নাগাল যখন পেলাম তখন তারা দার্জিলিংপাড়ায় ঢুকছে। কেওকারাডং থেকে কয়েকশ গজ নিচে এই গ্রামের অবস্থান। বেশ শিক্ষিত মনে হল প্রায় শ'খানিক অধিবাসীর এই ছোট্ট গ্রামটি। আশে পাশের পাহাড়গুলো সব মেঘে ঢেকে গেছে। বৃষ্টি তখনও কমেনি। সেখানকার একমাত্র দোকানটিতে বসে চা খেলাম। তারপর বৃষ্টির মধ্যেই আবার রওয়ানা হলাম। আর বেশী পথ বাকি নেই। জোরে জোরে পা চালাচ্ছি। বৃষ্টিভেজা আবহাওয়ায় ক্লান্তির রেশ অনেকটা ধুয়ে গেছে। চূড়ার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি কিন্তু নাগাল পাই না। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ছোটকাল থেকে বইয়ের পাতায় দেখে আসা সেই কেওকারাডংশীর্ষ উদ্ধতভাবে দণ্ডায়মান চোখের সামনে। পায়ে পায়ে উঠে এলাম বাংলাদেশের হিমালয়ের শীর্ষ চূড়ায়। হৃদয়জুড়ে খেলা করছে এভারেস্ট জয়ের অনুভূতি। শুণ্যের পানে মুষ্টিবদ্ধ হাত উচিয়ে কাজী নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হল– 'আমি চির বিদ্রোহী বীর, বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা, চীর উন্নত শীর'। ঘন মেঘের উড়াউড়ি চূড়ার উপর। কুয়াশার মত বহমান ধোয়াশা আর ভেজা নিঃশ্বাস-এই হল মেঘ। হাতের কাছে পেলে অবাধ্য মেঘের দলকে ছুয়ে চেপে ধরার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মেঘের রাজ্যে ঢুকে বোঝা গেল-এ কোন ধরার বস্তু নয়, কেবলই অনুভবের। ঘড়িতে তখন বেলা ৩টা বেজে পার হয়ে গেছে।


কেওকারাডং-এর চূড়া

লালা বাবুর রেস্ট হাউজে :

চূড়ায় উঠে দেখি বেশ এলাহী কারবারই। এই এলাকা এখন সরকারী বনবিভাগের নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানায় লীজ দেয়া হয়েছে। ব্যোম উপজাতিভুক্ত লাল মুন থন লালা পরিবারের মালিকানাধীন এই কেওকারাডং পাহাড়সহ পার্শ্ববর্তী পাহাড়সমূহ। লালা সাহেবের বাবা এই বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তার নাকি কেবল পাহাড়ী



লালা বাবুর রেস্ট হাউজ

গয়ালই ছিল ২/৩ হাজার। এখন সেই জাঁকজমক আর নেই। তবে ভূ-সম্পত্তিগুলো এখনও এই পরিবারের আয়ত্বে আছে। লালা সাহেব, তার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধু আর ১ বছর বয়সী চমৎকার এক নাতি–এই ক'জন মিলেই পরিবারটি। কেওকারাডং চূড়া পর্যন্ত সরকারীভাবে যে সিঁড়িটি করা হয়েছে তার গোড়াতেই একটা দোতালা কাঠের বাড়িতে তাদের বাস। মাত্র মাসতিনেক পূর্বে ৩টি কাঠের কটেজ নির্মাণ করে লালা বাবু হোটেল ব্যবসা শুরু করেন। নামটাও দিয়েছেন বেশ গালভারি–'কেওকারাডং মোটেল কমপ্লেক্স'। প্রতিটি কটেজে ১২ জন

থাকতে পারে। দূরের কোন ঝিরিতে পাইপ বসিয়ে মেশিন দিয়ে সরাসরি পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির সামনে রাখা বিশাল গাজী ট্যাংক। লালা বাবুর স্ত্রী আমাদেরকে গোসলের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'বাড়িতে যেয়ে গল্প করবেন কেওকারাডং-এ গোসল করেছি'। আমাদের অবশ্য তখন দীর্ঘ পথ হেটে ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। গোসল না করে কোনমতে হাত-পা ধুয়েই খাওয়ার টেবিলে বসে পড়লাম। মেন্যু ডিম, সব্জি আর ডাল। গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম যদিও রান্না তেমন সুস্বাদু মনে হয়নি।

জোঁকের জোকারি :

খাওয়া শেষে চা পান করছি। হঠাৎ পায়ের পাতার উপর নরম কিছু পড়ল। তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটা সরিসৃপ। ফুলে ঢ্যাবঢেবে হয়ে আছে। সামনেই বসা ছিল গাইড। জোঁক, জোঁক বলে চেচিয়ে উঠে বলল, ইয়া আল্লাহ! এতবড় জোঁক আমি কখনও দেখিনি। আমি বেশ মজাই পেলাম জোঁকটি দেখে। ভাবছি ভাগ্য ভাল, সময় মত চোখে পড়েছে, নতুবা এত বড় জোঁক কামড়ালে কি বিপদেই না পড়তাম। ভ্রমণ কাহিনীগুলোতে জোঁক থেকে সতর্ক হওয়ার কথা অনেকবার পড়েছি। গাইড লবন নিয়ে এসে জোঁকটি মারতে বসল। সবাই সে দৃশ্য দেখছে। এ সময় নাজীব বলল, তোমার পায়ে কোথাও কামড়ালো না তো! আমি পাজামা একটু উচু করতেই দেখি রক্তের লম্বা স্রোত। ব্যাথার লেশমাত্র নেই, অথচ এত রক্ত! আঁৎকে উঠলাম। গাইড বাইরে থেকে দূর্বাঘাস এনে চিবিয়ে পায়ে লাগিয়ে দিল। কিন্তু মিনিট দশেক ধরে থাকার পরও রক্ত বন্ধ হয় না। এ অবস্থাতেই উপরে উঠে আমাদের জন্য নির্ধারিত কটেজের ব্যালকনিতে বসে পড়লাম। মাহফুয ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিল। তাতেও কোন কাজ হল না। অবশেষে গামছা দিয়ে শক্ত করে পা বেঁধে বসে রইলাম। জোঁকের কামড় খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। এমন কি তার আকার-আকৃতিও মনে নেই। আর আমাকে দিয়েই শুরু হল জোঁকের জোকারি। পরে জানলাম সাধারণত ক্ষত থেকে এত রক্ত বের হয় না, অনেকক্ষণ কামড়ে ধরে রাখার ফলেই রক্তের প্রবাহ এত বেশী। আশ্চর্যের বিষয় হল প্রাণীটিকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এরা শরীরে কেবল ধমনীর উপরই ছিদ্র করে এবং শিকারকে কিছু বুঝতে না দিয়ে নীরবে রক্ত শুষে নেয়। এদের মুখে এমন এক লালা নিঃসরিত হয় যার ফলে রক্ত জমাট বাধতে চায় না, আবার ক্ষতস্থানে কোন ব্যথাও করে না।

সুন্দরের রাজ্যে জীবন গদ্যময় :

বেলকনীতে বসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চূঁড়া থেকে নীচের পৃথিবী দেখছি। এখানকার পৃথিবীর সীমানা অনেক সুবিস্তৃত। বেলকনি থেকে উত্তর দিকটা পাহাড়ের এ মাথা ও মাথা পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সদ্য বৃষ্টিস্নাত অবারিত পৃথিবী। যতদূর চোখ যায় কেবল সবুজে সবুজে অপরূপ পাহাড়ের সারি। পেজা তুলার মত শুভ্র মেঘের ভেলা সেসব পাহাড়ের কোলে পরম আদরে আশ্রয় পেতেছে। হঠাৎ রংধনুর আলোড়নে হেসে উঠল মেঘলা পূবাকাশে। সবমিলিয়ে প্রকৃতি কি যে এক মনোহর ঐন্দ্রজাল তৈরী করেছে এই পড়ন্ত বিকেলে, তার খবর প্রকৃতি নিজেও বুঝি রাখে না। 'সুন্দরে সুন্দরে দেয় পাল্লা, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ'-গানের কলিটি বাস্তবিকই আজ হাজির হয়েছে কেওকারাডং চূড়ায় আমাদের স্বাগত জানাতে। চোখ ধাঁধিয়ে আসে ভয়ংকর সে সৌন্দর্যে। মাগরিবের পূর্বে লম্বা সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠলাম সর্বোচ্চ চূড়ার উপর যেখানে সেনাবাহিনী ফলক বসিয়েছে ১৯৯৩ সালে। পাশেই পাকা ছাউনী ঘেরা বসার জায়গা। ঝড়ো বাতাস আর মেঘের প্রবল আনাগোনার মধ্যে সেখানে বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলাম। দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না মেঘের ধোয়াশায়। তুষার ঝড়ের মত আবহাওয়া। সূর্যাস্তের স্থানটিও ঠাওর করার উপায় নেই। ঘড়ি দেখে মাগরিবের সময় অনুমান করে কাফী ভাইকে বললাম আযান দিতে। ইথারে ভেসে ভেসে সে আযানের ধ্বনি বুঝি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। আযান দিয়ে খুশীতে উজ্জ্বল কাফী ভাইয়ের চেহারা। উনার প্রবল বিশ্বাস কেওকারাডং চূড়ায় উনিই হলেন প্রথম এবং একমাত্র আযানদাতা। আমরাও সোৎসাহে সায় দিলাম। হতেও তো পারে, হাহা...।


বেলকনী থেকে তোলা পাহাড়ের মাঝে আটকে থাকা মেঘের দৃশ্য

বাদ মাগরিব কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। চারিদিকে শুনশান নীরবতা। পর্যটন মৌসুম নয় বলে পর্যটক বলতে আমরা ৪জনই। নতুবা এত নিরিবিলি থাকার সৌভাগ্য হত না। কাঠের ঘরে টিমটিমে প্রদীপের আলোয় এক ভিন্ন আমেজ অনুভব করছি। মাঝে মাঝেই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে বোধ হয় কোন এক অজানা গ্রহে আছি। রাতের খাবারের ডাক এল। লালা বাবুর ডাইনিং রুমে মুরগীর গোশত দিয়ে ভাত পরিবেশন করা হয়েছে। মাগরিবের পূর্বে নাজীব ও কাফী ভাইয়ের যৌথ প্রচেষ্টা জবাই করা হয়েছিল বিরাট পাহাড়ী মুরগীটি। রান্না যথারীতি সুস্বাদু মনে হল না। খাওয়া-দাওয়া সেরে লালা বাবুর টেলিটক নাম্বার থেকে বাসায় কথা বললাম। এখানে কেবল টেলিটকেরই নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সিঁড়ি বেয়ে চূড়ায় উঠলাম চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশুতি রাতের শোভা উপভোগ করার লোভে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। মেঘে ঢাকা আকাশ। চাঁদ নেই। নিশ্ছিদ্র আঁধার জমে আছে পাহাড়ের রাজ্য। বহু দূরে রুমা বাজারের আর্মী গ্যারিসনের হাজারো লাইটের ফুটফুটি দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে মিয়ানমার বর্ডারে বিজিবি ক্যাম্পের টিমটিমে আলো। এছাড়া কোথাও কোন আলোর কোন চিহ্ন নেই। পরিবেশটা জমল না। কিছুক্ষণ পর নাজীবরা নীচে নেমে ঘুমাতে গেল। আমি আর মাহফুয রয়ে গেলাম। গল্প করতে করতে আরও ঘন্টাখানিক পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়ে চাঁদের আভাস মিলেছে। মৃদু আলোয় ইতিমধ্যে নিচের পাহাড়গুলো স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। খাঁজে খাঁজে আটকে থাকা দুগ্ধ ফেনিল শুভ্র মেঘের সাথে চাঁদের মধুর মিতালীতে পৃথিবীটা তখন এক পরাবাস্তব সপ্নিল জগৎ হয়ে উঠল। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম! আহ, সাদা ভূষণে মোড়া এই স্বর্গ দেখার লোভেই তো এতক্ষণ জেগে থাকা! প্রকৃতির এই নির্বাক রূপরহস্য ভেদ করার জন্য এই মধ্যরাতে আমরা দুটি প্রাণী ছাড়া কেওকারাডং জুড়ে আর কেউ নেই। সুদূর থেকে ভেসে আসা শিকারে বের হওয়া কোন শিয়াল বা হুতুমের পিলে চমকানো হুংকারও কানে আসে না। কেবলই নিঝুমঝুম স্তব্ধতা। পলে পলে সময় বয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো গলে গলে পড়ছে পাহাড় বেয়ে অনেক নিচে, মেঘ সমুদ্রে। তন্ময় আমরা অভিভূত। একসময় ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ১২টা বাজতে চলেছে। নাহ, এবার ঘরে যেতে হবে, নয়তো শুক্লাপক্ষের আধফালি চাঁদের আকর্ণ বিস্তৃত নরম হাসিতে বিমুগ্ধ এই মন মাতাল করা রাত যে কতক্ষণ নির্ঘুম আটকে রাখবে কেওকারাডং শীর্ষে, তা কে জানে! ঘরে ফিরে দুটো কম্বল গায়ে টেনে ঘুমিয়ে পড়লাম ক্লান্ত শরীরে। *(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

স্মৃতির পাতায় মাওলানা বদীউযযামান

[আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র বর্ষীয়ান মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা বদীউযযামান (৭৩) বাংলা ১৩৪৭ মোতাবেক ১৯৩৯ ইং সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার আলাতলী ইউনিয়নের রাণীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী জার্জিস মণ্ডল। স্থানীয় আলেম মাওলানা আব্দুর রঊফের নিকটে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর ভারতের দিলালপুরে পড়াশুনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ময়মনসিংহের 'বালিয়া' মাদরাসা থেকে 'দাওরায়ে হাদীছ' সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারোরশিয়া মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে উজানপাড়া (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), দারুল হাদীছ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), আলাদীপুর (নওগাঁ) ও গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি মাদরাসায় দীর্ঘ ২২ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৯২ সালে তিনি নওদাপাড়াস্থ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মাদরাসা 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র মুহাদ্দিছ হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর যাবৎ তিনি এখানে শিক্ষকতা করার পর গত ১৪ নভেম্বর রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রি ৯ ঘটিকায় মহিষালবাড়ীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুনামের সাথে কর্মরত ছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের নিকটে অতি প্রিয়। দেশে-বিদেশে তাঁর বহু ছাত্র ও গুণগ্রাহী রয়েছে। নিম্নে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের স্মৃতিচারণ তুলে ধরা হ'ল।]

যোগ্য ছাত্র তৈরির আদর্শ কারিগর

-নূরুল ইসলাম

একজন আদর্শ শিক্ষক জ্ঞান-সমুদ্রের আহরিত অমূল্য সম্পদ ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করেন অন্তঃপ্রাণ হয়ে। তিনি নিত্য-নতুন বিষয় ছাত্রদেরকে শেখানোর মাধ্যমে মনের গহীন কন্দরে এক অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করেন। এ জাতীয় মহান শিক্ষকদের নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকে ছাত্রদেরকে পথ দেখিয়ে উন্নতি-অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেয়া। এরকম শিক্ষককে ইংরেজিতে বলে Mentor 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এর কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বর্ষীয়ান মুহাদ্দিছ ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' পরিচালিত দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য, আমার পরম প্রিয় শিক্ষক মাওলানা বদীউয্যামান ছিলেন আমার জন্য Mentor সদৃশ। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা নওদাপাড়া মাদরাসায় তাঁর শিক্ষক হিসাবে যোগদানের (১৯৯২) পর থেকে মৃত্যু অবধি (১৪.১১.১২, ৭৩ বছর বয়সে) বলবৎ ছিল। সুদীর্ঘ ২০ বছরের এ পথপরিক্রমায় ছাত্র ও পরবর্তীতে সহকর্মী হিসাবে একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রতিচ্ছবি তাঁর মধ্যে অহর্নিশ লক্ষ্য করেছি খুব কাছ থেকে।

বয়সে প্রবীণ, স্পৃহাই নবীণ-এটা ছিল তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক। বিপ্লবী কবি নজরুল বলেছেন- 'বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কংকাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন'। ছাত্রদেরকে পাঠদানে অলসতা, অবহেলা, দায়সারাভাব তাঁর মধ্যে কখনোই দেখিনি। সর্বদা তিনি ছাত্রদেরকে নতুন নতুন জিনিস শিখাতে উদগ্রীব ছিলেন। মনের মধ্যে কোন নতুন চিন্তার উদয় হলে ছাত্রদেরকে তা শেখানোর জন্য তিনি আকুলি-বিকুলি করতেন। মৃত্যুর ৪/৫ মাস পূর্বে তিনি আমাকে একদিন মারকাযের লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রবেশ করেই সরফের একটি পুরাতন জীর্ণশীর্ণ বই বের করে পরম আন্তরিকতায় ذَرْ (যার) শব্দের তা'লীল শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বেও ক্লাসে তিনি আমাদেরকে উক্ত শব্দের তা'লীল করে দিয়েছিলেন।

তিনি কোন ছাত্রকে পড়াশোনায় অমনোযোগী বা দুষ্টুমী করতে দেখলে প্রায়শই আলী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি তারস্বরে আবৃত্তি করে শুনাতেন- ليس اليتيم الذى مات والده — ان اليتيم يتيم العلم والأدب 'যার পিতা মারা গেছে সে প্রকৃত ইয়াতীম বা অনাথ নয়। বরং জ্ঞান ও শিষ্টাচারে দৈন্য ব্যক্তিই প্রকৃত ইয়াতীম'।

ছাত্রদেরকে তারকীব শেখানোতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি যখন আমাদেরকে 'তাফসীরে জালালাইন' পড়াতেন তখন প্রায় প্রতিটি আয়াতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারকীব করে দিতেন। মাঝে মাঝে ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে জালালাইনের শরাহ 'কামালাইন' ও 'আল-ফুতূহাতুল ইলাহিয়াহ' আমাদেরকে দেখাতেন এবং জটিল তারকীবের সহজ সমাধান করে দিতেন। পাঞ্জেগাঞ্জ, শরহে মিয়াতে আমেল, ইলমুল সীগাহ, ফুসূলে আকবরী পড়ানোর সময় তাঁর একাগ্রতা আমাকে বিমুগ্ধ-বিমোহিত করত। ক্লাসে পড়া আদায়ের ব্যাপারে তিনি বজ্রকঠিন ছিলেন। পড়া না পারলে তাঁর পিটুনি থেকে রেহাই পাওয়ার জো ছিল না। তিনি আমাদেরকে 'ফার্সী কী পহেলী কিতাব' পড়াচ্ছেন। ক্লাসের প্রথম দিন। কিছু পড়া দিয়েছেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যেকোন শব্দ বা বাক্যের উর্দূ বললে ফার্সী করতে হবে আর ফার্সী বললে উর্দূ করতে হবে। ক্লাসে আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'দোযখ কী আগ' (জাহান্নামের আগুন) এর ফার্সী কি? এ প্রশ্ন করে তিনি পিছনে লাঠি ঝুঁকাচ্ছিলেন। এটা তাঁর অভ্যাস ছিল। লাঠি ঝুঁকানো দেখে ভয়ে আমার ঐ বাক্যটির ফার্সী 'আতাশে দোযখ' মনে আসছিল না। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করলেও ১/২ বাড়ি 'লাগিয়ে দিলেন'।। সেদিন থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এরপর আর কোনদিন ঐ ক্লাসে তাঁকে মারার সুযোগ দেব না। দেইওনি।। ঐদিনের প্রতিজ্ঞা আমার জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। আমার মৃত লাশকেও যদি বলা হয়, দোযখ কী আগ এর ফার্সী বলতে তাহলেও মনে হয় বলে দিতে পারবে!

মাসিক 'আত-তাহরীকে' তিনি নিয়মিত ফৎওয়া লিখতেন। নিজের হাতের লেখা ভাল না হওয়ায় বিভিন্ন ছাত্রকে দিয়ে তিনি ফৎওয়া লিখিয়ে নিতেন। ছাত্র জীবনে ও পরবর্তীতে আমি তাঁকে অনেক ফৎওয়া লিখে দিয়েছি। আমার লিখে দেয়া ফৎওয়া তিনি খুব পছন্দ করতেন। অনেক সময় দেখা যেত, কোন ছাত্র তাঁকে ফৎওয়া লিখে দিয়েছে, কিন্তু সেটার ভাব-ভাষা ওস্তাদযীর পছন্দ হয়নি। তিনি আমাকে মারকায লাইব্রেরীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'বেটা! এই ফতোয়াটায় একটু ভাষা লাগিয়ে দাও'।

ফতোয়া লেখার জন্য একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও গবেষণা প্রয়োজন। এ গুণগুলি তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তাঁকে আমি একটি ফৎওয়া লিখে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে ফৎওয়াটি লিখানোর পূর্বে বলেছিলেন, এ বিষয়ে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মাঝে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল। বেটা, উত্তরটা ভালভাবে লিখতে হবে। এরপর তিরমিযীর জগদ্বিখ্যাত শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' সহ কয়েকটি বই বের করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। আমি ফৎওয়া লেখা শেষ করে তাঁকে পড়ে শোনালাম। তিনি খুব খুশি হলেন এবং অন্তরখুলে দো'আ করলেন। তিনি মাঝে মধ্যে রসোচ্ছলে বলতেন, 'আমি লিখতে পারলে ফৎওয়া লিখে ফাটিয়ে দিতাম'। এরপর মুখ থেকে ঠিকরে পড়ত চিরচেনা অট্টহাসি।

সুদীর্ঘ ৪২ বছর কুরআন মাজীদ ও হাদীছে নববীর দরসে নিবেদিতপ্রাণ এই আদর্শ শিক্ষকের ইন্তেকালে আমি দারুণভাবে ব্যথিত, মর্মাহত, বাকরুদ্ধ। তাঁকে ঘিরে অসংখ্য স্মৃতি ভীড় করছে স্মৃতি-বন্দরে। নোঙর করতে চাচ্ছে কলমের ডগায় ভর করে লেখনীর হরফে। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তবুও সর্বদা রয়েছেন মনের গভীরে, স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায়। কবির ভাষায়- 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে/ রয়েছ নয়নে নয়নে'।

মহান আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে ঠাঁই দিয়ে সম্মানিত করেন! আমীন!!

প্রেরণার বাতিঘর

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

আমাদের সকলেরই জীবনে এমন কিছু কিছু মানুষের সরব উপস্থিতি থাকে যাদের অনুপ্রেরণা, যাদের নিরন্তর উৎসাহ আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য নিত্যই জাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। মাওলানা বদীউয্যামান উস্তাদজীকে আমি কেবল শিক্ষক হিসাবেই নয়, বরং সেরকম একজন প্রেরণার বাতিঘর হিসাবেই জানি ও মানি। নিজ গুণে যিনি 'শিক্ষক' পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বহু ছাত্রদের অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বড় একটা স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। যার মৃত্যু মনের গভীরে রেখে গেছে শূন্যতার ছাপ, রেখে গেছে স্মৃতিময় হাজারো অব্যক্ত মুহূর্ত।

শিক্ষক হিসাবে সকল ছাত্রের প্রতি ছিল তাঁর সমান দৃষ্টি, তবে যারা একটু ভাল তাদেরকে তিনি স্বভাবতই একটু বিশেষ নজরে দেখতেন। সে কারণেই বোধ হয় ক্লাস নাইনে উঠার পর তাঁর সাথে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়। ইতিপূর্বে আমরা তাঁকে খুব ভয় করতাম। ক্লাসে ঢুকতেন বড় বেত নিয়ে। কেউ পড়া ঠিকমত আদায় করতে না পারলেই কড়া শাসন। এজন্য তাঁর ক্লাসে ছাত্ররা সবসময় থাকত ভয়ে তটস্থ। অনেক দুর্বল ছাত্রকেও দেখতাম, যেভাবেই হোক অন্ততঃ তাঁর ক্লাসের পড়া শিখে আসত। ক্লাস নাইনে তিনি আমাদের পড়াতেন তাফসীর জালালাইন। ক্লাসে ঢুকেই ইবারত পড়তে বলতেন। সঠিকভাবে পড়তে পারলে যেমন খুব খুশী হতেন, তেমনি ভুল ধরতে পারলেও খুশী হতেন। ঐ যে একটু শেখানোর সুযোগ পেলেন! ছাত্রদের শেখানোতেই যেন তার অপার আনন্দ। একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী হত উস্তাদজীর সাথে। কয়েকদিন এমন হয়েছে যে, উস্তাদজীর কোন এক জায়গায় ভুল হয়েছে, আমরা সঠিকটা বলেছি। উস্তাদজী এতে কখনো মনঃক্ষুণ্ন তো হনই নি, বরং পরদিন আরো প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমাদের ঠেকিয়ে দিতে চাইতেন। আমরাও ভালভাবে পড়ে আসতাম যেন উস্তাদজী কোথাও ঠেকাতে না পারেন। এজন্য তাঁর ক্লাসটা খুব মজার হত এবং তাঁর ক্লাসের পড়াটা খুব ভালভাবে করা হত। পরে দাওরা পড়ার সময় তিনি প্রথম বর্ষে তাফসীর মারাগী পড়াতেন। সেখানেও একই অবস্থা। ক্লাসের নির্ধারিত পড়ার বাইরেও আরবী ব্যকরণ সংক্রান্ত নিত্য-নতুন নানা খুঁটি-নাটি বিষয় আমাদের শেখাতেন। এমন অনেক ছোট ছোট জিনিস আজও মনে আছে, যেটা তাঁর কাছে শিখেছিলাম। নতুন কিছু শেখাতে পারলে কি যে খুশী হতেন! তাঁর সে খুশীর রেশ ক্লাসে সবার মাঝে যেন ছড়িয়ে পড়ত।

তাঁর ক্লাসটি হতো খুব প্রাণবন্ত ও আনন্দময়, অথচ পড়া এবং পড়াসংক্রান্ত বিষয় ব্যতিরিকে এক মুহূর্ত সময় তিনি অন্য কথায় ব্যয় করতেন না। ক্লাসে ঘুমানো বা বিরক্তিবোধের কোন সুযোগ দিতেন না। সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ শিক্ষক হলেও তিনি মানসিকতায় ও শারিরীক সুস্থতায় যেন ছিলেন সবার চেয়ে তরুণ। পূর্ণ বই বা সিলেবাস পড়িয়ে শেষ করার জন্য তাঁর যে উদ্যম ছিল, তা অনেক তরুণ শিক্ষকের মাঝেও দুর্লভ। নীচু ক্লাসগুলোতে তাঁকে আমরা যেমন ভয় করতাম, ঠিক তেমনি অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু দাওরা ক্লাসে এসে সে সম্পর্ক রূপ নিল একেবারে বন্ধুর মত আপন। ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় আমাদের ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলতেন। ছাত্রদের শাসন করার সাথে সাথে বন্ধুর মত এভাবে কাছে টেনে নেয়ার অসাধারণ গুণ তাঁর মাঝে ছিল। ছাত্রদের মাঝে সময় কাটাতেই ছিল যেন তাঁর আনন্দ।

মানুষ হিসাবে তাঁর বড় গুণ ছিল, তিনি ছিলেন কথা-বার্তা, আচার-আচরণে একেবারেই সহজ-সরল ও অকপট। তাঁর মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। যা ভাবতেন ও মানতেন, তা কোনরূপ রাখঢাক ছাড়াই অকপটে বলে ফেলতেন। এই সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে অনেকসময় বিপদে পড়তে হয়েছে আবার কারো কারো বিরাগভাজন হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিশুসুলভ সারল্যের কারণে সেই ক্ষোভ ও বিরাগভাব কারো মনে জমা থাকত না।

আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হওয়ার পর কেন্দ্রীয় মারকায এক বড় ধরনের সংকটে পতিত হয়। আত-তাহরীকের জনপ্রিয় 'ফৎওয়া বিভাগ' নিয়ে সৃষ্টি হয় দারুণ সংশয়। কিন্তু সেদিনগুলোতে উস্তাদজীর ভূমিকা ছিল খুবই আন্তরিক ও দৃঢ়তাপূর্ণ। বলা যায় আত-তাহরীকের ফৎওয়া বিভাগের দায়িত্ব তিনি একাই পালন করেছিলেন। ফৎওয়ার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করতেন এবং ছাত্রদের সাথে যেভাবে তা নিয়ে আলোচনা করতেন, তাতে বোঝা যেত, ফৎওয়া প্রদানের জন্য কতটা দায়িত্ববান ছিলেন তিনি। তাঁর মত একজন একনিষ্ঠ খাদেম না পেলে সেই দুঃসময়ে আত-তাহরীকের 'ফৎওয়া বিভাগ'কে সত্যিই এক দুর্বহ সংকটে পড়তে হত। জীবনের শেষ দিকে (২০০৭-২০০৯) এসে অনেক যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। ফলে তাঁর মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন এক সচেতনতা ও স্পিরীট তৈরী হয়। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁর মাঝে সেই চেতনা প্রগাঢ়ভাবে অক্ষুণ্ন ছিল। মনে-প্রাণে ভালবাসতেন এ আন্দোলনকে এবং আমীরে জামা'আতকে। যুলুমের শিকার হয়ে মারকাযে যখন তাঁর থাকা-খাওয়া সবকিছু বন্ধ করে দেয়া হল, তখন এক পর্যায়ে তাঁকে কয়েকমাস যাবৎ মাসিক আত-তাহরীকের কম্পিউটার রুমে অবস্থান করতে হয়। সেখানে বসেই তিনি ফৎওয়া লিখতেন। মারকায চত্বর, এমনকি মসজিদে যাওয়াও তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সেসময় মাঝে মাঝে তাঁকে আমাদের বাসা থেকে খাবার পাঠাতাম। বাসায় বানানো চা তিনি খুব পছন্দ করতেন। একদিন 'পাকান' পিঠা বানিয়ে পাঠানো হল। বড় সাইজের ১০/১২টি পিঠা সবই খেয়ে ফেললেন। আমার তো চোখ কপালে ওঠার দশা। এতেই বুঝেছিলাম তিনি কেমন ভোজন রসিক মানুষ। শেষ বয়সেও তিনি যে পরিমাণ খেতে পারতেন, তার কাছে আমরা নস্যি। মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর যৌবন বয়সের যে খাওয়ার ফিরিস্তি শোনাতেন, তাতে আমরা কেবল হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।

২০১১ সালের রামাযান মাসে লাইব্রেরীতে তাঁর কাছে আরবী ব্যাকরণের একটি জটিল বিষয় কয়েকদিন পড়েছিলাম। খুব খুশী হয়েছিলেন। উনি খুবই চাইতেন যেন সময় করে উনার কাছে যেয়ে নিয়মিত আরবী ব্যাকরণের কোন বিষয় পড়ি। একদিন সন্ধার পরে তাঁর ঘরে ঢুকেছি পড়ার জন্য। আমের মৌসুম। ঘরে কেউ নেই। উনি চৌকির তলা থেকে দু'টি আম বের করে নিজ হাতে ধুয়ে আনলেন বাথরুম থেকে। তারপর প্লেটে করে খেতে দিলেন। আমি তো ভীষণ বিব্রত উস্তাদজীর কাজ দেখে। তবু উনি জোর করে নিজের বিছানায় বসিয়ে দু'টো আমই খেতে বাধ্য করলেন। অসুস্থ শরীরে তাঁর এই আন্তরিক ভালবাসার প্রকাশে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। এমন মানুষ কি কখনও স্মৃতির আঁড়াল হতে পারেন!

মাস্টার্স শেষ করার পরও কেন মাদরাসায় ক্লাস নিতে যাচ্ছি না তা নিয়ে তিনি দেখা হলেই অনুযোগ করে বলতেন, 'ক্লাস নিচ্ছ না কেন? শিক্ষকতা করতেই হবে, নতুবা তোমার চর্চা থাকবে না তো!' গবেষণা রুমে বসে আছি, হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ভূমিকা ছাড়াই কোন একটা

ফৎওয়ার বিষয়ে কথা বলা শুরু করলেন। মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখা হয়ে দেখা হল, ব্যাস! সোজা ফৎওয়া বোর্ডে নিয়ে গিয়ে কোন একটি ফৎওয়ার সমস্যা দেখিয়ে সমাধান করে দেয়ার জন্য বললেন। এমনই অকপট ও সোজাসাপ্টা ছিলেন উস্তাদজী। এমন কত যে স্মৃতি আছে তাঁর সাথে! মানসিক শক্তি তাঁর এতই দৃঢ় ছিল যে, চরম অসুস্থতার মধ্যেও আবার মারকাযে ফেরার আশা প্রকাশ করতেন। মারকায নিয়ে, ফৎওয়া নিয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। এমন মহৎপ্রাণ, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের জন্য গর্ববোধ না করে কি পারা যায়!

জানাযার পর তাঁকে দাফন করা হচ্ছে। ভীড়ের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর লাশ নামিয়ে কবরে শায়িত করা হল। সফেদ মুখটা কেবলামুখী করে ঢেকে দেয়া হল শেষবারের মত। সদা চঞ্চল প্রিয় উস্তাদজীকে আর দেখবো না কোনদিন মারকায চত্বরে...নিজের অজান্তেই চোখটা ভিজে আসল। পাশে মুযাফফর ভাইকে দেখলাম আনমনে কম্পমান ঠোঁটে চোখ মুছতে। শূন্য হৃদয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি সেই মাটির শয্যার দিকে। সারিবদ্ধভাবে একটার পর একটা বাঁশের টুকরায় সেই শয্যা ঢেকে যাচ্ছে...ক্ষীণতর হয়ে আসছে ভিতরের সর্বশেষ আলোটুকু...। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে...আহা...কী যে অদ্ভুত এক মায়ার এ জগৎ। ভেবে পাই না, এত মায়া-মমতার মাঝেও কীভাবে যেন আশ্রয় পেয়ে যায় হিংসা-বিদ্বেষের মত অপবিত্র মন্ত্রণাগুলো!! আল্লাহ উনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। আমীন!

আমার পরম শিক্ষাগুরু

-মেসবাহুল ইসলাম

আমি সৌভাগ্যবান যে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে। এখানে আমি প্রথম ভর্তি হই চতুর্থ শ্রেণীতে। যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম তখন থেকে আমাদের ক্লাস নিতেন মাওলানা বদীউযযামান উস্তাদযী। তিনি এমন একজন শিক্ষক যার প্রতি ভক্তি, অনুরাগ নেই এমন ছাত্র পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর। অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী এই মহান উস্তায ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অলসতাবশত কোন ক্লাস ছেড়ে দিয়েছেন, তা আমার ১৩/১৪ বছরের ছাত্রজীবনে কখনো দেখিনি। অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তার বিষয় ছিল ছাত্রদের পড়াশুনার উন্নতি-অগ্রগতি। ক্লাসের পড়া তিনি ক্লাসেই আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। পরে কোন পড়া ছাত্রদের নিকট কঠিন মনে হলে তিনি যেভাবেই হোক বুঝিয়ে ছাড়তেন। মাঝে মাঝেই এমন হত যে, আমি রাস্তায় চলাচলের সময় যদি হঠাৎ করে তার সাথে সাক্ষাৎ হত, তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুর মত চলতেন আর বলতেন আজকের পড়া বুঝেছ? তারপর ক্লাসের সেই পড়া আমাকে রাস্তাতেই আবার বলে দিতেন। ছাত্রদের পড়ানোর জন্য তিনি এতই উদগ্রীব ছিলেন যে, একবার নওদাপাড়ায় বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় মারকাযে যখন মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। কোথাও বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। সেই সময় তিনি আমাদের রুমে রুমে গিয়ে খুঁজছিলেন পড়ানোর জন্য। অথচ আমরা তখন ইজতেমার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছি। তিনি আরবী ২য় পত্রের বিভিন্ন জটিল বিষয় নিয়ে যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে ছাত্রদের ডেকে ধরে বসতেন। না পারলে সেটা জানিয়ে দিতেন। ছাত্রদের পড়ানোর বিষয়ে তিনি সর্বদা একপায়ে খাড়া। এজন্য সময় ও মেধা ব্যয় করতে তাঁর কোনরূপ কার্পণ্য ছিল না। ছাত্রদের সামনে পেলেই তার মন যেন আনচান করে উঠত তাদের কিছু শেখানোর জন্য। একদিন এশার ছালাতের আযান হয়েছে। আমি অযু করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়েছি। পথিমধ্যে সিঁড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, মেসবাহ! বলতো بسم الله এর ب টি লম্বা কেন? এভাবে তিনি যখন-তখন অনেক প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন এবং না পারলে অতি আগ্রহের সাথে শিখিয়ে দিতেন।

যখন তিনি মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার 'ফৎওয়া বিভাগে'র সম্মানিত সদস্য মনোনীত হলেন তখন বিভিন্ন ছাত্রদের ডেকে নিয়ে ফৎওয়া লিখিয়ে নিতেন। কারণ তাঁর বাংলা হাতের লেখা ছিল ছিল বেশ অস্পষ্ট। প্রতি মাসে তিনি প্রায় ১০/২০টি ফৎওয়া লিখতেন। যখন লেখনীর চাপ বৃদ্ধি পেল তখন তিনি আমাকে ও হাফেয হাসিবুল ইসলামকে বিশেষভাবে ফৎওয়া লেখক বা কাতেব হিসেবে মনোনীত করেন। তার কাতেব হিসাবে নিয়োজিত হতে পেরে আমরা খুব গর্ববোধ করতাম। কারণ ফৎওয়া লিখতে গিয়ে তাঁর কাছে বহু কিছু শেখার সুযোগ হত। খুবই জ্ঞানপূর্ণ মতবিনিময় হত। তার মন ছিল শিশুর মত সহজ-সরল। মজার ব্যাপার ছিল, যখন তিনি ডিকশনারী বা নিজের পড়া কোন বইয়ে কিছু খুঁজতেন, তখন কোনদিন সূচিপত্র দেখতেন না। তিনি ছিলেন এর ঘোরবিরোধী। ছাত্ররা সবাই তাঁর এই ব্যাপারটি জানত এবং খুব মজা পেত। তিনি সূচী না দেখেই বইটি ১/২ বার উল্টিয়েই তার কাঙ্খিত জায়গাটি পেয়ে যেতেন। তাঁর এই দক্ষতায় ছাত্ররা বিস্মিত হলে তিনি খুশীতে বাগ-বাগ হয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাসম্পন্ন অথচ একেবারেই নিরংহকারী ব্যক্তি। ফৎওয়ার জন্য তিনি সারাদিন লাইব্রেরীতে খাটা-খাটুনী করতেন। পরে রাতে ফৎওয়া লিখতে বসে প্রতিটি বিষয় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তারপর ফৎওয়া লিখতে বলতেন। যদি কোন ফৎওয়া খুঁজে পেতে দেরী হত, তখন তিনি প্রায় প্রত্যেক ছালাতের সময় আমাকে বলতেন, কেন ফৎওয়াটি পাওয়া যাচ্ছেনা। তিনি সেই ফৎওয়ার পিছনে রাত-দিন লেগে থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধানে আসতে না পারেন। ২০০৫ সালে যখন আমীরে জামা'আতসহ সংগঠনের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন, তখন আত-তাহরীকের 'দারুল ইফতা' সদস্যদের তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে 'আত-তাহরীক'-এর জন্য ফৎওয়া লিখতেন। এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ফলে আমরা ফৎওয়া লেখার জন্য তাঁর বাড়ী গোদাগাড়ীতে যেতাম। তিনি রোগে কাতর হয়ে পড়েছেন। উঠার মত শক্তি নেই। তবুও তিনি ফৎওয়া লেখার ব্যাপারে সামান্যতম মনোবল হারাননি। সুস্থ অবস্থায় যেমন লিখতেন তখনও তেমনি লিখতেন। তবে তিনি শুয়ে থেকেই ফৎওয়া লিখতেন। যখন কোন প্রশ্ন তার নিকট আমরা বলতাম তখন তিনি বলতেন, অমুক বইটি দাও। আমরা তাঁর শোয়া অবস্থাতেই তার হাতে বইটি দিতাম। তিনি বই দেখে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলে দিতেন, যা আমরা সহজেই লিখে নিতে পারতাম। পরে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তিনি আবার সুস্থ হয়ে মারকাযে ফিরে আসেন। জানি না পড়াশোনার টানেই কি-না, জীবনের শেষ দু'টি বছর মারকায লাইব্রেরীরই একপার্শ্বে তিনি থাকা শুরু করেন। প্রায় সারাক্ষণই দেখতাম চেয়ার-টেবিলে গবেষণারত থাকতে। একদিন কথার মাঝে উস্তাদজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ফৎওয়া কোন গ্রন্থে আছে, তা এত সহজে আপনি বুঝতে পারেন কীভাবে? তিনি তখন বলেছিলেন যে, এই লাইব্রেরীর সকল বই আমার নজরে আছে। শুধু তা-ই নয়, তিনি লাইব্রেরীর একজন দক্ষ সংরক্ষকও ছিলেন। কার কাছে কোন বই আছে তার হিসাব পূর্ণভাবে রাখতেন। এমনকি যখন তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, নড়াচড়া করতে পারেননা। তখনও আমরা মাদরাসার কয়েকজন ছাত্র তাঁর নিকট গিয়েছিলাম দেখা করার জন্য। হঠাৎ করে তিনি আমাদের একজনকে বললেন, তোমার কাছে অমুক বই আছে, তুমি তা লাইব্রেরীতে দিয়ে দিবে। তিনি ছিলেন তাক্বওয়াসম্পন্ন ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী মানুষ। পড়ানোর সময় আযাবের কোন বর্ণনা আসলে তিনি শিশুর ন্যায় অশ্রুসজল নয়নে কেঁদে উঠতেন। যতটুকু জানি তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। একজন আদর্শ ও ছাত্রঅন্তঃপ্রাণ শিক্ষক হিসাবে আমার হৃদয়পটে তাঁর স্মৃতি চিরজাগরুক থাকবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ দরজা দান করুন এবং তাঁর ছাত্র হিসাবে আমাদেরকে তাঁর পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

সেই ছেলেটি

-রেহনুমা বিনতে আনীস
ক্যালগেরী, কানাডা

ছেলেটার কথা শুনেছি অনেক, কিন্তু দেখেছি একবারই। রাতের অন্ধকারে বিল্ডিংয়ের সানশেডের নীচে সিঁড়ি থেকে যে সামান্য আলো ঠিকরে পড়ছিল সেই আলো আঁধারীতে বসে পড়াশোনা করছিল। আমাকে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। মাঝারী রকম লম্বা, ফর্সা, টানা টানা দু'টো চোখ, মায়াবী চেহারা, হাল্কা ঢেউ খেলানো চুল কানের দু'পাশ বেয়ে নেমে এসেছে, বয়স বিশ হলেও দেখতে আরো ছোট মনে হয়। সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করছ?'

বলল, 'ম্যাডাম, ক'দিন পরই বি এ পরীক্ষা, প্রস্তুতি নিচ্ছি'।

আমি বললাম, 'তাহলে তুমি পড়, আমি আর ডিস্টার্ব না করি। ভাল করে পরীক্ষা দিয়ো'।

আর কোন কথা হলনা। কিন্তু হাফিজ সাহেব আসতে দেরী হচ্ছিল, খুব অস্বস্তি লাগছিল যে সে আর কিছুতেই আমার সামনে বসলনা, দাঁড়িয়েই রইল যতক্ষণ না আমরা বাইক নিয়ে চলে এলাম।

আমাদের ছোট্ট স্কুলটা দিনে দিনে বড় হতে থাকে। স্কুলের পরিধির সাথে সাথে একসময় কাজের পরিমাণও বাড়তে থাকে। দেখা গেল প্রায়ই সন্ধ্যার পর নানা ধরনের ট্রেনিং, আলোচনা বা অনুষ্ঠান থাকছে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত পিয়নরা সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় শিফটে রাত পর্যন্ত কাজ করে পরদিন আবার ভোরে স্কুল খুলতে আসে, এটা তাদের ওপর জুলুম হয়ে যাচ্ছে। তখন একজন নাইটগার্ডের প্রয়োজন দেখা দিল যে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত গেট খোলাবন্ধ করবে এবং সকালে স্কুল খুলে দেবে। যেহেতু কাজের পরিমাণ কম তাই এই কাজের জন্য বেতন বরাদ্দ ছিল অল্প। এই বেতনে উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়াটা ছিল বেশ মুশকিলের ব্যাপার। কারণ তাকে বিশ্বস্তও হতে হবে। এগিয়ে এলো আমাদের পিয়ন জামশেদ। বলল, 'আমার ফুপাত ভাই সাইফুল ভাল ছাত্র, টাকার অভাবে ওর পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ওকে যদি এই কাজ দেয়া হয় তাহলে সে বেতনের টাকা দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারবে, পাশাপাশি পড়াশোনা করার মত যথেষ্ট সময়ও পাবে'। এতে উভয়পক্ষের উপকার হয়। ওর চাকরী হয়ে গেল।

আমাদের নানান কাজে প্রায়ই সন্ধ্যার পর স্কুলে যাওয়া হত। কিন্তু ভীষণ লাজুক এই ছেলেটির সাথে দেখা হতনা খুব একটা। তবে ওর প্রশংসা শুনতাম সবার কাছে। সে ছালাতের ব্যাপারে ভীষণ নিয়মিত ছিল, এমনকি তাহাজ্জুদ ছালাত, কিন্তু সে ছালাত একাই পড়তনা, সবাইকে ডেকে ডেকে পড়তে উৎসাহিত করত, সবাই বলতে আমাদের যেসব স্টাফ স্কুলের পেছনে স্টাফ কোয়ার্টারে থাকত, তার মধ্যে ওর মামাত ভাই জামশেদও ছিল। মুখচোরা ছেলেটি দিনের বেলা খুব প্রয়োজন ব্যতিরেকে রুম থেকে বেরই হতনা। অন্যান্য পিয়নরা অনেক সময় স্কুলের আয়াদের সাথে কথাবার্তা বলত, সে কিছুতেই সামনে আসতনা। রুমের ভেতর ঘাপটি মেরে পড়াশোনা করত আর সন্ধ্যা হলেই নিজের কাজে লেগে যেত।

একদিন সকালে স্কুলে গিয়ে দেখি স্টাফ কোয়ার্টারের ওখানে বেশ ভিড়। বাচ্চাদের বকাঝকা করে ওখান থেকে তাড়া করা হচ্ছে। ব্যাপার কি? ওপরতলায় গিয়ে শুনলাম অদ্ভুত ঘটনা। রাতে গেট বন্ধ করে, খেয়েদেয়ে, গল্পসল্প করে ওরা সবাই ঘুমাতে গেল। মধ্যরাতে জামশেদ বাথরুমে যাবার জন্য উঠে সাইফুলকে ডাক দিল, 'কি রে, আজ তাহাজ্জুদ পড়বিনা?' সে কোন সাড়া দিলনা। জামশেদ ভাবল, হয়ত আজ শরীরটা ভাল নেই, তাই আর কিছু বললনা। ভোরে ফজর ছালাতের সময়ও সাইফুল উঠলনা। জামশেদ ভাবলো শরীর মনে হয় নিতান্তই খারাপ, নইলে সে প্রতিদিন ভোরে উঠে ছালাত পড়ে কুর'আন পড়ে। সকালে স্কুল খোলার টাইমেও ওর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে জামশেদ গিয়ে ধাক্কা দিল। গায়ে হাত দিতেই সে চমকে উঠল। হিম হয়ে আছে সাইফুলের দেহ। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার, প্রিন্সিপাল স্যারসহ অন্যান্য লোকজন মিলে গিয়ে দেখার পর সবাই হতবাক হয়ে গেল, ছেলেটা আসলেই রাতে ঘুমের ভেতর মারা গিয়েছে! বিশ বছর বয়স, কিন্তু ওর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে!

কয়েক ঘন্টার ভেতর গ্রাম থেকে ওর বাবা এলেন। আমাদের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিলো না, এমনটা কি করে হতে পারে? স্কুল কর্তৃপক্ষ পোস্ট মর্টেম করতে চাইল। কিন্তু ওর বাবা বললেন, 'আমার ছেলেটাকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন। আমি মেনে নিয়েছি। ওর মৃতদেহটাকে আপনারা আর কষ্ট দিয়েন না। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ওকে দাফন করতে চাই'। কিন্তু বেচারা দরিদ্র মানুষ, শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত যে লাশ পরিবহন করবেন সেই সামর্থ্য তো তার নেই। তাকে আশ্বস্ত করা হ'ল, 'আপনি বাড়ী যান, দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করুন, আমরা লাশ নিয়ে আসছি'। উনি চলে গেলেন। স্কুল ছুটির পর আমরা দু'টো মাইক্রোবাস ভাড়া করে একটাতে ওকে নিলাম, আরেকটাতে প্রিন্সিপ্যাল স্যারসহ আমরা কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক গেলাম। ওদের গ্রামের বাড়ী পৌঁছতেই চারিদিক থেকে গ্রামবাসী ঘিরে ধরল। ভাল ছেলে হিসেবে সুপরিচিতির কারণে সবাই সাইফুলকে খুব পছন্দ করত। তাই তারা তাকে শেষবারের জন্য এক নজর দেখতে এসেছে।

আমরা গিয়ে ওদের ঘরে প্রবেশ করতেই বাড়ীর মহিলারা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। আমরা মহিলা শিক্ষকরা ভেতরে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলাম। কি বলব সেই মাকে যে বসে ছিল ছেলে বিএ পরীক্ষা দেবে, ভাল চাকরী করবে, তাদের সংসারে অভাব দূর হবে, ছেলেকে সে মনের মত করে খাওয়াতে পারবে, বিয়ে দেবে, নাতি-নাতনীদের নিয়ে উঠোনে বসে খেলবে? কি বলে বোঝাব সেই বোনটিকে যে বসে আছে ভাই শহর থেকে তার জন্য খেলনা কিনে আনবে, ভাইকে সে পিঠা বানিয়ে খাওয়াবে? ওদিকে পুরুষমহলেও একই অবস্থা। হৃদয়বিদারক একটি দিন শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত আচ্ছন্ন হৃদয়মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

সাইফুলকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা খুব একটা কঠিন ছিলনা। যে সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখত তাকে মনে করাটাই তো আসলে কঠিন। শুধু জামশেদ এই স্মৃতি ভুলতে পারলনা। সে প্রথমে অন্যত্র বাসা নিলো। পরে অন্যত্র চাকরী নিয়ে চলে গেল। তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখত সবসময়।

আর আমরা। কেন যেন এই পরিবারটিকে আমরা ভুলতে পারতাম না। ওরা দরিদ্র ছিল, কিন্তু ওদের ছেলেটিকে ওরা নৈতিক শিক্ষায় দীক্ষিত করেছিল। ভুলতে পারতাম না ওর বাবা কি কঠিন পরিস্থিতিতে কি অসাধারণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন যেন তার ছেলেটি মৃত্যুর পর কোন কষ্ট না পায়। কি করে ভুলব সেই দুঃখিনী মাকে যে তার প্রথম সন্তান হারিয়ে বাকহারা হয়ে গিয়েছিল? তাই হয়ত প্রতিবছর ঘুরেফিরে সাইফুলের মৃত্যুর সময়টাতে আমরা একবার ওর গ্রামের বাড়ী ঘুরে আসতাম, ওর পরিবারের খোঁজখবর নিতাম। আমাদের কিছুই ছিলনা

ওদের দেয়ার মত। তবু হেলিকপ্টার নামধারী বাইকটা নিয়ে চলে যেতাম সেই সুদূরে, ওদের একনজর দেখে আসতাম। ওরা খুশি হত, আমরাও মনে শান্তি পেতাম।

একবার সাইফুলদের বাড়ীতে যাবার পথে বাইকে বসে দু'জনে কথা বলতে বলতে আমরা ভুল করে ডানে মোড় নেয়ার পরিবর্তে বাঁয়ে মোড় নিয়ে অনেকদূর চলে গেলাম। চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখেই সন্দেহ হল, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!' তবু পথ খুঁজে পাবার ক্ষীণ আশা নিয়ে আরো কিছুদূর যাবার পর সামনে একটা নদী দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম ভুল পথে এসে পড়েছি। ঐ মোড় পর্যন্ত পুরোটা পথ ফিরে গিয়ে আবার ডানে মোড় ধরতে হবে। হাফিজ সাহেব বললেন, 'শোন, যেহেতু এতদূর চলেই এসেছি, চল তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। শর্ত একটাই, যতক্ষণ ওখানে থাকবে কোন শব্দ করতে পারবেনা'। একটু অবাক হলাম এমন অদ্ভুত শর্তে, কিন্তু ভাবলাম, 'যাক, একটা নতুন জায়গা যদি ঘুরে দেখা যায় আর অসুবিধা কি?'

একটু পর উনি বাইক এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিলেন, দেখি এই প্রত্যন্ত গ্রামের ভেতর শত শত লেটেস্ট মডেলের দামী দামী গাড়ী, আমাদের ছোট্ট বাইকখানা রাখার জায়গা পাওয়াই মুশকিল! তারস্বরে গান বাজছে, পথের দু'ধারে নানারকম জিনিসের পসরা, ভাবলাম হয়ত কোন মেলা বসেছে। ভেতরে গিয়ে দেখি সারিসারি কবর, নতুন কবর, পুরান কবর, বড় কবর, ছোট কবর, ঘেরা দেয়া কবর, ঘেরা ছাড়া কবর। কোন কোন কবরের ওপর দামী ঝালর পাতা কিংবা আরো অনেক কারুকাজ করা, প্রতিটি কবরের পাশেই কেউ না কেউ বসে পয়সা নিচ্ছে, কেউ কেউ বসে কুর'আন পড়ছে, কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম বোরকা পরা মহিলারা কবরের সামনে ঝুঁকে সিজদা দিচ্ছে! চোখের সামনে স্পষ্ট শিরক দেখে আমার গা শিউরে উঠল, আমি চিৎকার দিতে যাচ্ছিলাম, 'কি করছেন আপনারা?' কিন্তু হাফিজ সাহেব আমার মুখ চেপে ধরলেন, 'খবরদার, এখানে কোন কথা বলবেনা, শুধু দেখতে থাকো'। ওখান থেকে বের হয়ে দেখলাম কয়েকটা পুকুর, ঐ পুকুরে খোসপাঁচড়া থেকে শুরু করে ক্যান্সারের রোগী নেমে গোসল করছে, আবার কিছু কিছু মানুষ ঐ 'পবিত্র' পানি বোতলে ভরে নিয়ে যাচ্ছে রোগাক্রান্ত কাউকে খাওয়ানোর জন্য যেন ওরা ভাল হয়ে যায়। আরেকটা চিৎকার উঠে এলো গলা থেকে, 'এই পানি খেলে তো সুস্থ মানুষও মারা যাবে!' চিৎকারটা মাঝ পথে গিলে ফেললাম কিন্তু হজম করতে পারলাম না। হাফিজ সাহেবকে বললাম, 'এখান থেকে চলো, আমার দম বন্ধ লাগছে!'

আজও সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে স্বাভাবিক হতে পারিনা। ভারতে দেখা যায় সেইসব মুসলিমদের সাথে হিন্দুদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, তাদের নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই যারা কবরপূজা করে। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাদের উভয়ের মাঝে পার্থক্য কেবল পূজার জন্য পূজ্য বেছে নেয়ায়, যেই আরাধ্য আল্লাহ নন, এছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ তাঁর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই' *(সূরা ইখলাস)*। এর চেয়ে স্পষ্ট আর কি নির্দেশ হতে পারে? তিনিই একমাত্র প্রভু, একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র দাতা এবং একমাত্র ক্ষমাকারী। তারপরেও শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরীব সকল ক্যাটাগরীর মানুষ কতগুলো কবরের সামনে কিছু মৃত মানুষের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছে- আমাকে একটি সন্তান দাও, আমাকে একটি চাকরী দাও, আমার পরীক্ষার ফলাফল ভাল করে দাও, আমাকে আরো ধনবান করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও- অথচ এই অসহায় মানুষগুলোর ক্ষমতা নেই তারা নিজের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে, তারা অপরের জন্য কি করবে? ওরা তো দুনিয়ার পাট চুকিয়ে চলে গিয়েছে! কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের পৃথিবীর সাথে আর কোন সম্পর্কে নেই সাদকায়ে জারিয়া ছাড়া। আল্লাহ বলেছেন কিয়ামতের দিন 'আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল? তারা বলবে-আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করতাম না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহগার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব' *(ফুরকান ১৭-১৯)*।

অথচ এই বেচারাদের অনেকেই আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবেই শিরক করছেন! যারা তাদের পথ দেখাতে পারত তারা তাদের প্রতারিত করছে, তারা এই সাধারন জনগোষ্ঠীর মূর্খতার সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রতারণা করে এবং যে প্রতারিত হয় উভয়ে সমান অপরাধী। কেননা আল্লাহ আমাদের বিবেক দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, বোধশক্তি দিয়েছেন, তারপরেও 'অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে' *(সূরা ইউসুফ ১০৬)*। কি করে মানুষ কাউকে সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ মনে করতে পারে যখন তিনি বলেই দিয়েছেন তাঁর সমতুল্য কেউ নেই? তবুও কেন মানুষের বোধোদয় না হয়! সামান্য একটু জানার অভাব, জানার চেষ্টা করার অভাব, অন্যের কথায় ফাঁকফোঁকর আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার অভাব কত মানুষকে ইসলামের নামে শিরকের পথে নিয়ে যাচ্ছে ভাবতেই অবাক লাগে।

কারো কারো বক্তব্য, 'আমরা তো তাদের কাছে চাইনা, আমরা তাদের বলি আমাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে'। কিন্তু প্রথমত তারা নিজেরাই মৃত, দ্বিতীয়ত আল্লাহর সাথে মধ্যস্ততা করার জন্য আমাদের কোন মাধ্যম প্রয়োজন নেই, তিনি নিজেই বলেছেন, 'কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?' *(বাকারা ২৫৫)*। আমরা দিনে পাঁচবার তাঁর সাথে নিয়মিত এবং এর বাইরে যখন ইচ্ছে তখন অনিয়মিতভাবে যোগাযোগ করতে পারি। বরং মাধ্যম খুঁজতে গিয়েই অনেক জনগোষ্ঠী পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাঁর নবীকে পর্যন্ত সাবধান করে দিয়েছেন, 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন' *(সূরা যুমার ৬৫)*।

সাইফুলকে হিংসা হয়। এত পঙ্কিলতার মাঝে সে পণ করে নিয়েছিল, 'নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য' *(সূরা আনআম ১৬২)* এবং সে অনুযায়ী নিজের ওয়াদা পূর্ণ করে কোন প্রলোভন কিংবা প্রতারণার দিকে না তাকিয়ে পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে চলে গিয়েছে। আমরা কি ততটা ভাগ্যবান হতে পারব?

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২

ঢাকা ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২**-এ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দারুল ইফতা'র সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার এবং কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ প্রমুখ।

উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুয়েতের শারঈ আদালতের সম্মানিত বিচারপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আল-আলামী'র পরিচালক ড. ফায়ছাল আল-হাশেমী। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান বক্তব্যে অত্যন্ত উজ্জীবিত হন উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ। তাঁর বক্তব্য আরবী থেকে তরজমা করে শোনান মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি বলেন, আমি আমার দ্বিতীয় দেশ এই সুন্দর বাংলাদেশে নামার পর চলতি পথে বিদ'আতের ছড়াছড়ি দেখতে পেয়েছিলাম। অতঃপর যখন আহলুস সুন্নাহ আহলেহাদীছের এই জামা'আতকে পেলাম, তখন খুশীতে আমার অন্তর ভরে গেল। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, হেদায়েত প্রাপ্তদের অনুসারী হও *(আন'আম ৯০)*। আলহামদুলিল্লাহ আহলেহাদীছরাই হল সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত দল। এটা সত্য যে, হকপন্থীরা সর্বদা সংখ্যায় কম হয়ে থাকে। তাই পথভ্রষ্টদের সংখ্যাধিক্য যেন আমাদেরকে হতাশ না করে। কেননা কুরআনে সংখ্যাগরিষ্টদের নিন্দা করা হয়েছে *(আন'আম ১১৬)*। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হল আহলেহাদীছরা কখনও চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা আমরা হলাম মধ্যপন্থী উম্মত *(বাক্বারাহ ১৪৩)*। কুরআনের অনুসারীদেরকে সর্বদা হতে হবে মধ্যপন্থী। অতএব 'আহলেহাদীছ' হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব হকের এই পথকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদেরকে অবশ্যই হকের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। আপনাদেরকে ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ শারঈ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহর কসম, বাংলাদেশে হোক, মক্কার হারাম শরীফে হোক এমনকি জান্নাতেই হোক মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ইলম অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে *(মুজাদালাহ ১১)*। সুতরাং যারা শারঈ ইলম অর্জন করেছেন, তাদের উচিৎ হল মানুষকে তার দিকে আহ্বান করা।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, 'যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান, রাজবাড়ী যেলা সভাপতি মুনীরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, বগুড়া যেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অহীদুয্যামান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম।

দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মিলনায়তনের বাইরে বসে বহু কর্মী প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তব্য শ্রবণ করেন। কর্মীদের মুহূর্মুহু শ্লোগানে সম্মেলন কক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রাণবন্ত এ সম্মেলনে বক্তাগণের বিষয়ভিত্তিক তথ্যবহুল আলোচনা কর্মীদের কর্মস্পৃহা, কর্মচাঞ্চল্য ও ঈমানী চেতনা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক বাধার কারণে সম্মেলনের কার্যক্রম যথেষ্ট বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি সম্মেলনের একদিন পূর্বে বিনা নোটিশে সম্মেলনের অনুমতি প্রত্যাহার করা হয় প্রশাসন থেকে। পরে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুমতি পাওয়া গেলেও সম্মেলনের আগ পর্যন্ত এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। অতঃপর আল্লাহর রহমতে নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পর থেকে শুরু করে দিনব্যাপী সুষ্ঠুভাবে সম্মেলনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ২০১২-২০১৪

ক্রমিক	নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	যেলা
১	মুযাফফর বিন মুহসিন	সভাপতি	এম.এ (পিএইচ.ডি গবেষক)	রাজশাহী
২	নূরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি	এম.এ (পিএইচ.ডি গবেষক)	রাজশাহী
৩	আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	সাধারণ সম্পাদক	এম.এ (পিএইচ.ডি গবেষক)	সাতক্ষীরা
৪	আব্দুর রশীদ আখতার	সাংগঠনিক সম্পাদক	কামিল	কুষ্টিয়া
৫	আব্দুল হালীম	অর্থ সম্পাদক	এম.এ	রাজশাহী
৬	আব্দুর রকিব	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	এম.এ	সাতক্ষীরা
৭	আরীফুল ইসলাম	তাবলীগ সম্পাদক	এম.এ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৮	মেছবাহুল ইসলাম	ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	এম.এ	দিনাজপুর
৯	হাসীবুল ইসলাম	তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ৪র্থ বর্ষ)	রাজশাহী
১০	আব্দুর রাকীব	সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ৪র্থ বর্ষ)	সাতক্ষীরা
১১	হাফিযুর রহমান	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ফাযিল (শেষ বর্ষ)	সাতক্ষীরা
১২	আব্দুল বারী	দফতর সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ২য় বর্ষ)	চাঁপাই নবাবগঞ্জ

যেলা সংবাদ

কমিটি গঠন : ২০১২-২০১৪

ঝিনাইদহ : গত ৩১শে অক্টোবর ২০১২ যুবসংঘ ঝিনাইদহ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দর রশীদ আখতার এবং সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারূনুর রশীদ। অনুষ্ঠান শেষে আসাদুল্লাহ মিলনকে সভাপতি এবং মনীরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নিলফামারী : গত ১১ই ডিসেম্বর যুবসংঘ নিলফামারী যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় যেলা সদর কার্যালয়ে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন এবং সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল জলীলকে সভাপতি এবং ওয়ালিউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

লালমণিরহাট : গত ১২ই ডিসেম্বর যুবসংঘ লালমণিরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় যেলা সদর কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন এবং সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ুমকে সভাপতি এবং আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

জামালপুর : গত ৯ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ জামালপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা বৈঠকের পর রাশেদুল ইসলামকে সভাপতি এবং শাহাদত হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

যশোর : গত ১৬ই নভেম্বর ২০১২ 'যুবসংঘ' যশোর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা বৈঠকের পর আশরাফুল আলমকে সভাপতি এবং আলমগীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

রাজবাড়ী : গত ৮ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ রাজবাড়ী যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাকীব। সংক্ষিপ্ত আলোচনা বৈঠকের পর আব্দুল্লাহ বিন হারেসকে সভাপতি এবং জাকারিয়া খাঁনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।।

কুমিল্লা : গত ২১শে ফেব্রুয়ারী যুবসংঘ কুমিল্লা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের উপস্থিতির থাকলেও ট্রাফিক জ্যামের কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হতে পারেন নি। অনুষ্ঠান শেষে জামীলুর রহমানকে সভাপতি এবং আহমাদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গাযীপুর : গত ১৫ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ গাযীপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। পরিশেষে হাতেম বিন পারভেজকে সভাপতি এবং আমীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সাতক্ষীরা : গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠান শেষে সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বগুড়া : গত ১লা নভেম্বর ২০১২ যুবসংঘ বগুড়া যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। পরিশেষে আব্দুর রাযযাককে সভাপতি এবং সাইফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নওগাঁ : গত ২১শে নভেম্বর যুবসংঘ নওগাঁ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। পরিশেষে হাফিযুর রহমানকে সভাপতি এবং ইমাজুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কুষ্টিয়া পশ্চিম : গত ১লা নভেম্বর যুবসংঘ কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারূনুর রশীদ। পরিশেষে আব্দুল গাফফারকে সভাপতি এবং আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী উত্তর : গত ৯ নভেম্বর যুবসংঘ রাজশাহী উত্তর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে মৌগাছি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। পরিশেষে মুস্তাকীম আহমাদকে সভাপতি এবং আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী দক্ষিণ : গত ২২ নভেম্বর যুবসংঘ রাজশাহী দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। পরিশেষে মনীরুল ইসলামকে সভাপতি এবং আব্দুর রহীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : গত ১০ই নভেম্বর যুবসংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয হাসিবুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাকীব, এবং দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী। পরিশেষে মেছবাহুল ইসলামকে সভাপতি এবং আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী কলেজ : গত ৪ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ রাজশাহী কলেজ কমিটি গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে দারুল আহলেহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম এবং দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী। পরিশেষে আবুল হোসেনকে সভাপতি এবং মোস্তাক আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা : গত ১৪ই ডিসেম্বর 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠান শেষে হুমায়ূন কবীরকে সভাপতি এবং আব্দুল ওয়াদুদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দিনাজপুর পূর্ব : গত ৭ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ দিনাজপুর পূর্ব যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী। পরিশেষে রমজান আলীকে সভাপতি এবং রায়হানুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দিনাজপুর পশ্চিম : গত ৮ই ডিসেম্বর যুবসংঘ দিনাজপুর পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম এবং দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী। পরিশেষে আব্দুর রহমানকে সভাপতি এবং ফরহাদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সিরাজগঞ্জ : গত ৬ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ সিরাজগঞ্জ যেলা পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন। অনুষ্ঠান শেষে শরীফুল ইসলামকে সভাপতি এবং শামীম আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

জয়পুরহাট : গত ৩রা নভেম্বর যুবসংঘ জয়পুরহাট যেলা পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। পরিশেষে আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি এবং আল আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নরসিংদী : গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ নরসিংদী যেলা পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন এবং ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম। পরিশেষে আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি এবং দেলোয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রংপুর : গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ রংপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর হালীম বিন ইলিয়াস এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাকীব। পরিশেষে শিহাবুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি এবং সাইফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মেহেরপুর : গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ যুবসংঘ মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। পরিশেষে মনিরুল ইসলামকে সভাপতি এবং আবুল বাশারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পাবনা : গত ৬ই ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ পাবনা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন। পরিশেষে তারিক হাসানকে সভাপতি এবং আনীসুর রহমান মারুফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

খুলনা : গত ২২শে নভেম্বর ২০১২ 'যুবসংঘ' খুলনা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয হাসিবুল ইসলাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ। পরিশেষে শুয়াইব হোসাইনকে সভাপতি এবং দিদারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ উত্তর : গত ১লা নভেম্বর ২০১২ যুবসংঘ চাঁপাই নবাবগঞ্জ উত্তর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। পরিশেষে মুখতারুল ইসলামকে সভাপতি এবং আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ দক্ষিণ : গত ২৮ অক্টোবর ২০১২ যুবসংঘ চাঁপাই নবাবগঞ্জ দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। পরিশেষে আরীফুল ইসলামকে সভাপতি এবং মেয়েজউদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পঞ্চগড় : গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ পঞ্চগড় যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাকীব। পরিশেষে মোযাহারুল হককে সভাপতি এবং আব্দুল লতীফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গাইবান্ধা পূর্ব : গত ২১শে ডিসেম্বর ২০১২ যুবসংঘ গাইবান্ধা পূর্ব যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম এবং দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী। পরিশেষে মশিউর রহমানকে সভাপতি এবং আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গাইবান্ধা পশ্চিম : গত ১৬ই নভেম্বর 'যুবসংঘ' গাইবান্ধা পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। পরিশেষে আব্দুল্লাহ আল মামুনকে সভাপতি এবং সাইফুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নাটোর : গত ১০ই নভেম্বর ২০১২ 'যুবসংঘ' নাটোর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম এবং নাটোর যেলা আন্দোলন সভাপতি ডঃ আহমাদ আলী। পরিশেষে আব্দুল মোমিনকে সভাপতি এবং সেলিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বাগেরহাট : গত ১৪ই নভেম্বর ২০১২ 'যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম। পরিশেষে আব্দুল মালেককে সভাপতি এবং মনিরুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

টাঙ্গাইল : গত ৯ই ডিসেম্বর 'যুবসংঘ' টাঙ্গাইল যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। পরিশেষে মাজীদ বিন শহীদকে সভাপতি এবং গোলাম মুস্তফাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পিরোজপুর : গত ২৫শে জানুয়ারী 'যুবসংঘ' পিরোজপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা সাবেক সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন। অনুষ্ঠান শেষে তাওহীদুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কর্মী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ

বগুড়া : গত ৯ই জানুয়ারী ২০১৩ 'যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে শাজাহানপুর থানার বৃকুষ্টিয়া মাদরাসা এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। উক্ত সমাবেশে প্রায় ৫ শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা : গত ২৫শে জানুয়ারী ২০১৩ 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। এছাড়া প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম ও আন্দোলন ঢাকা যেলা সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার।

মেহেরপুর : গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ 'যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে সদর থানার উত্তর শালিকায় এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। উক্ত সমাবেশে প্রায় সহস্রাধিক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী : গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ 'যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস প্রমুখ।

উপযেলা সংবাদ

বাগমারা, রাজশাহী : গত ১৭ই জানুয়ারী ২০১৩ 'যুবসংঘ' রাজশাহী বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ আয়োজিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন এবং মাওলানা যিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কয়েকটি ব্লগে জঘন্য লেখা প্রকাশ ও দেশব্যাপী নিন্দা

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় রাজীব হায়দার নামক জনৈক ব্লগারের নিহত হবার পর তার বিরুদ্ধে ব্লগে রাসূল (ছাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে অতি জঘন্য লেখা প্রকাশের অভিযোগ উঠে। পত্র-পত্রিকায় এ সকল কুরুচিপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। এর প্রতিবাদে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সারাদেশে জুম'আর ছালাত পরবর্তী বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান জানায় দেশের বেশ কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুক্রবার বাদ জুম'আ দেশের সকল যেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ময়দানে নেমে আসে। কিন্তু সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে পুলিশ মারমুখীভাবে এই বিক্ষোভ দমন করে এবং তাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও লাঠিচার্জে সারাদেশে ৪ জন নিহত এবং কয়েকশত মুছল্লী আহত হয়। গ্রেফতার হয় আরো কয়েক হাজার। গায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে পুলিশের ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ হত্যা হতবাক করে দেয় সবাইকে। সরকারের এই মারমুখী অবস্থানের প্রতিবাদে ও নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবীতে বিক্ষুব্ধ ইসলামী দলগুলো দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান জানায় ২২ তারিখ রবিবার। সারাদেশে এদিন শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হলেও পুলিশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার কারণে মানিকগঞ্জে নিহত হয় আরো ৫ জন। বর্তমানে একদিকে সরকারের দমননীতি, অন্যদিকে এই কুরুচিপূর্ণ ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে দেশব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইন্টারনেটে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম ব্লগিং-এর চর্চা শুরু হয় ২০০৬ সালে 'সামহোয়্যার ইন ব্লগ'-এর মাধ্যমে। মুক্ত লেখালেখি ও মতপ্রকাশের জায়গা হিসাবে এই ব্লগগুলি তরুণসমাজে দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু মুক্ত মতপ্রকাশের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর ব্লগার দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষায় রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র হনন এবং ইসলামী আইন ও বিধানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাতে থাকে। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ব্লগ এসব অশ্লীলভাষী নাস্তিক ব্লগারদের কেবল সুযোগই দেয় নি; বরং সহযোগিতা করেছে। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদ প্রচারে শীর্ষস্থানীয় সামহোয়্যার ইন ব্লগ, আমার ব্লগ, মুক্তমনা ব্লগ, নাগরিক ব্লগ, প্রথম আলো ব্লগ, ধর্মকারী ব্লগ, নবযুগ ব্লগ, সচলায়তন ব্লগ, অগ্নিসেতু ব্লগ ইত্যাদি নামের ব্লগগুলো অনবরত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর মদদে দ্বীন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের পাঁয়তারায় লিপ্ত রয়েছে। এদের অশুভ অপতৎপরতা সম্পর্কে মিডিয়ায় কোন রহস্যময় কারণে এ পর্যন্ত কিছুই প্রকাশ পায় নি। বর্তমানে যখন দেশব্যাপী এই নাস্তিক ব্লগারদের অপকীর্তি ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও সেক্যুলার মিডিয়াগুলো এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে বরং প্রকারান্তরে জোর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। ইসলামপন্থী ব্লগ বলে পরিচিত 'সোনার বাংলা' ব্লগকে সরকার তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দিলেও এসকল নাস্তিক্যবাদী ব্লগ ও ওয়েব সাইট এখনও বন্ধ করা হয় নি। যে সব ব্লগাররা বিভিন্ন 'নিকে' নগ্নভাবে ইসলাম বিদ্বেষ প্রচার করে আসছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইসলামবিদ্বেষী স্বঘোষিত কুখ্যাত নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দীন, আরিফুর রহমান ওরফে নিতাই ভট্টাচার্য, সুব্রত শুভ, আশীষ চ্যাটার্জী, অরুণ মজুমদার, তন্ময় তালুকদার, অভিজিৎ রায়, সুমিত চৌধুরী, বিপ্লব কান্তি দে, শুভজিৎ ভৌমিক, প্রিতম দাস, রনদ্বিপম বসু, ডাক্তার আইজুদ্দীন, চিন্তিত সৈকত ওরফে সৈকত বড়ুয়া, শর্মি আমিন, আল্লামা শয়তান ওরফে বিপ্লব, আহমেদ রাজিব হায়দার শোভন, অমিত হাসান, নূর নবী দুলাল, ইব্রাহীম খলীল সবাক, পারভেজ আলম, আশরাফুল ইসলাম রাতুল, তানজিমা, আরজ আলী মাতব্বর, নাস্তিকের ধর্মকথা, দূরের পাখি প্রমুখ শয়তানরূপী নাস্তিক ব্লগাররা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন 'নিক' নামে রাসূল (ছাঃ) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর কুরুচিপূর্ণ ও জঘন্য লেখা নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, অনেকে মুসলিম 'নিক' নিয়ে ব্লগিং করে, অথচ তারা মূলতঃ হিন্দু। এদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন পর হলেও যে আওয়াজ উঠেছে তা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলনের ফলে সরকার ইতিমধ্যে একটি ইন্টারনেট মনিটরিং সেল গঠন করেছে। সচেতন মহল আশা করছে, এই মনিটরিং সেলের মাধ্যম সরকার সকল নাস্তিক্যবাদী ব্লগ এবং ব্লগারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সাথে তরুণ সমাজের চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ সকল ওয়েবসাইট ব্লক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র কুরআন

সারা বিশ্বে ১ নং র‌্যাংকিংধারী যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের প্রবেশমুখে ন্যায়বিচার বিষয়ক একটি কুরআনের আয়াত টানিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কুরআনের সূরা নিসা'র ১৩৫ নং আয়াতে সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ ন্যায়বিচার পেতে পারে।

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা ন্যায়বিচারের ওপর অটল থাক, যদিও এটা তোমাদের, তোমাদের বাবা-মায়ের এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়; হোক সম্পদশালী অথবা গরীব– সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। যদি ন্যায়বিচার অস্বীকার করো অথবা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করো, তবে জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত *(সূরা নিসা ১৩৫)*।

সৌদি দৈনিক আজেল পত্রিকা জানায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল্লাহ জুম্মা নামের একজন ছাত্র তার টুইটারে এ ঘটনা জানান। ঐ ছাত্র লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের প্রবেশমুখে যে আয়াতটি লেখা হয়েছে, তা বিশ্বে ন্যায়বিচারের ইতিহাসের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ হিসেব মূল্যায়িত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ১৫০ জন স্টাফ ও শিক্ষার্থীর মতামতের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কুরআনের এই আয়াতটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বিশ্বের মানুষ ন্যায়বিচার কিভাবে পাবে তার সুস্পষ্ট নিদের্শনা রয়েছে কুরআনের এই কথাগুলোতে। কুরআনের এই আয়াতের কথার প্রেক্ষিতে এখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক ও গবেষকরা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো ন্যায়বিচারকদের শনাক্ত করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

মালির সালাফী সংগঠন আনছারুদ্দীন বিরুদ্ধে পশ্চিমা দমন অভিযান

১১ই জানুয়ারী ২০১৩ মালির সালাফী বিদ্রোহী সংগঠন আনছারুদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে ফরাসী নেতৃত্বাধীন আফ্রিকান কোয়ালিশন বাহিনী। গত বছর মালির উত্তরাঞ্চলের দেশটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর আনছারুদ্দীন সংগঠনটি। অবশেষে তাদেরকে দমনের জন্য মালির প্রেসিডেন্ট বিদেশী সামরিক সহায়তা আহ্বান করলে ফরাসী সামরিক বাহিনী এই অভিযান শুরু করে। পরে আফ্রিকান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশও এই অভিযানে যোগদান করে। এমনকি আনছারুদ্দীনের সাবেক সহযোগী এমএনএলএ গ্রুপটিও এই বাহিনীর সহায়তা করছে। এই সম্মিলিত সামরিক জোট ক্রমাগত বিমান ও স্থল হামলার মাধ্যমে ৭ই ফেব্রুয়ারী উত্তর মালির অধিকাংশ স্থান বিদ্রোহীদের দখলমুক্ত করে।

উল্লেখ্য, উক্ত সালাফী সংগঠনটি গত বছর মে-জুন মাসে টিম্বুকটু শহরের ছূফী সাধকদের বড় বড় মাযারসমূহ ভেঙে ফেলার মাধ্যমে সারাবিশ্বের নজর কাড়ে। তারা সমগ্র মালিতে ইসলামী শরী'আ আইন চালু করা এবং সকল প্রকার শিরকের মূলোৎপাটন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল।

অভিযোগ উঠেছে আফ্রিকার ৩য় বৃহত্তম স্বর্ণ উৎপাদকারী দেশ মালির প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তগত করার মতলবেই আন্তর্জাতিক বাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। উল্লেখ্য, মালিতে বর্তমানে ৭টি স্বর্ণখনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করা হচ্ছে।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মোট কয়টি সিটি কর্পোরেশন?
উত্তর: ১১টি।
২. প্রশ্ন : ঘোষিত সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন কোনটি?
উত্তর: গাজীপুর।
৩. প্রশ্ন : বর্তমানে আয়তনে বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন কোনটি?
উত্তর: গাজীপুর।
৪. প্রশ্ন : বর্তমান দেশের পৌরসভার সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ৩১৫টি।
৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন যেলাকে সর্বপ্রথম ডিজিটাল যেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
উত্তর: যশোর।
৬. প্রশ্ন : দেশের প্রত্যেক উপযেলায় একটি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু হয় কবে থেকে?
উত্তর : ১ জানুয়ারী ২০১৩।
৭. প্রশ্ন : দেশের বেসরকারী (রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয় কবে জাতীয়করণের ঘোষা দেয়া হয়?
উত্তর: ৯ জানুয়ারী ২০১৩।
৮. প্রশ্ন : ২০১৩ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে বছরে কয়টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর: ২টি। (ষান্মাসিক ও বার্ষিক)
৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমান উপযেলা কয়টি? উত্তর: ৪৮৬টি।
১০. প্রশ্ন : আর্থ-সামাজিক ও জনমিতি জরিপ ২০১১ অনুযায়ী দেশের স্বাক্ষরতার হার কত? উত্তর: ৪৭.৬৮%।
১১. প্রশ্ন : টেলিটকের থ্রিজি ইন্টারনেট মডেমের নাম কি?
উত্তর: ফ্ল্যাশ (Flash)।
১২. প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর কবে, কোথায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়?
উত্তর: ১০ জানুয়ারী ২০১৩ নীলফামারীর সৈয়দপুরে (৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।
১৩. প্রশ্ন : কোন দুটি দেশ বাংলাদেশে অভিন্ন দূতাবাস ভবন নির্মাণ করছে? উত্তর: ফ্রান্স ও জার্মানি।
১৪. প্রশ্ন : বরিশালকে 'প্রাচ্যের ভেনিস' নামে কে নামকরণ করেন?
উত্তর: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: চট্টগ্রামে।
১৬. প্রশ্ন : বিজিবির গোয়েন্দা সংস্থার বর্তমান নাম কি?
উত্তর: বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো (BSB)।
১৭. প্রশ্ন : আধুনিক কাঁদুনে গ্যাস 'পিপার স্প্রে'-এর মূল উপাদান কি? উত্তর: মরিচের গুড়া।
১৮. প্রশ্ন : 'বাঙ্গালী' নামক নদীটি কোন যেলায় অবস্থিত?
উত্তর: বগুড়া।
১৯. প্রশ্ন : লালবাগ কেল্লার প্রাচীন নাম কি?
উত্তর: আওরঙ্গবাদ দূর্গ।
২০. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সরকারী ছাপাখানার নাম কি?
উত্তর: বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রেস (বিজি প্রেস)।
২১. প্রশ্ন : কোন যেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী?
উত্তর: যশোর।
২২. প্রশ্ন : কোন বাংলাদেশী উপজাতির পারিবারিক কাঠামো মাতৃতান্ত্রিক? উত্তর: গারো।
২৩. প্রশ্ন : পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারটি কি নামে পরিচিত?
উত্তর: সোমপুর বিহার।
২৪. প্রশ্ন : স্কাইপি (Skype) কি?
উত্তর: ভিডিও ফোন করার জনপ্রিয় সেবা।
২৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট কতটি শাখা রয়েছে?
উত্তর: ৯ টি।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : ২০১৩ সালের ইসলামী সাংস্কৃতিক রাজধানী কয়টি ও কি কি?
উত্তর: ৪টি। যথাঃ ত্রিপলী (লিবিয়া), মদীনা (সউদী আরব), গজনী (আফগানিস্তান) ও কানো (নাইজেরিয়া)।
২. প্রশ্ন : ২০১৩ সালের ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক রাজধানী কোনটি?
উত্তর: মর্শেই (ফ্রান্স) ও কোসিকে (স্লোভাকিয়া)।
৩. প্রশ্ন : ২০১৩ সালের আরব সাংস্কৃতিক রাজধানী কোনটি?
উত্তর: বাগদাদ (ইরাক)।
৪. প্রশ্ন : ২০১৩ সালের আমেরিকান সাংস্কৃতিক রাজধানী কোনটি?
উত্তর: ব্রাংকুইলা অ্যান্টোয়ার্প (কলাম্বিয়া)।
৫. প্রশ্ন : 'ডটার অফ পাকিস্তান' উপাধিতে ভূষিত হয় কে?
উত্তর: মালালা ইউসুফজাই।
৬. প্রশ্ন : এস এম এস (SMS)-এর জনক কে?
উত্তর: ম্যাট্রি ম্যাক্কোনেন।
৭. প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির সুপার কম্পিউটার কোনটি?
উত্তর: টাইটান।
৮. প্রশ্ন : জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বশেষ স্বীকৃত রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর: ফিলিস্তিন।
৯. প্রশ্ন : পাকিস্তানের ঘোষিত নতুন প্রদেশের নাম কি?
উত্তর: বাহাওয়ালপুর জানুবি পাঞ্জাব।
১০. প্রশ্ন : অ্যান্টার্কটিকার উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ 'ভিনসন ম্যাসিফ' প্রথম কোন বাংলাদেশী জয় করেন?
উত্তর: ওয়াসফিয়া নাজরীন।
১১. প্রশ্ন : ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় নাম কি?
উত্তর: স্টেট অফ প্যালেস্টাইন।
১২. প্রশ্ন : ক্যাপিটাল হিল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ওয়াশিংটন ডিসি।
১৩. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুলের নাম কি?
উত্তর: টাইটান (দৈর্ঘ ১০ ফুটেরও বেশি)।
১৪. প্রশ্ন : ২০১২ সালে বিশ্বে চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: ভারত।
১৫. প্রশ্ন : ফেইসবুকের সার্চ ইঞ্জিনের নাম কি?
উত্তর: গ্রাফ সার্চ।
১৬. প্রশ্ন : খাদ্যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভোক্তা কোন রাষ্ট্র?
উত্তর: চীন।
১৭. প্রশ্ন : 'আনসার দ্বীন' কোন দেশের বিদ্রোহী দলের সামরিক সংগঠন?
উত্তর: মালি।
১৮. প্রশ্ন : কোন মুসলিম দেশের শূরা কাউন্সিলে ত্রিশজন নারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে?
উত্তর: সৌদি আরবে।
১৯. প্রশ্ন : ই-মেইলের জনক কে? উত্তর: টমলিনসন।
২০. প্রশ্ন : মালদ্বীপ গঠিত হয়েছে কিভাবে?
উত্তর: অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে।
২১. প্রশ্ন : ইতিহাসের বিখ্যাত ট্রয় নগরী কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: তুরস্কে।
২২. প্রশ্ন : প্রথম কারা বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন?
উত্তর: ফিনিশীয়রা।
২৩. প্রশ্ন : প্যালেস্টাইন নিউজ এজেন্সি বা ওয়াফা (WAFA) কি?
উত্তর: ফিলিস্তীন জাতীয় কতৃপক্ষের সংবাদ সংস্থা।
২৪. প্রশ্ন : বিশ্বে খেজুর উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: মিসর।
২৫. প্রশ্ন : বৈদ্যুতিক রেলপথের দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শীর্ষে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।